# পৃথিবী বিশাল

বিশ্বনাথ ঘোষ

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—
বি. ঘোষ
হুগলী

প্রথম প্রকাশ
১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৮



প্রচ্ছদপট শিল্পী : শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রাকর :—
ভারতী প্রেস
১৪, হরিপদ দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য তিন টাকা মাত্র

## লেখকের কথা

বাংলা দেশে লেখক মাত্রেই সাহিত্যিক কিনা জানি না, তবে পাঠকমাত্রেই যে সমালোচক এই ব্রহ্মজ্ঞান আমার সমকালীন পাঠক গোষ্টির সাম্প্রতিক বাচনিক থেকে হয়েছে। একটু ভুল হয়ে গেল, ব্যাকরণশুদ্ধ করে বলতে হয় পাঠক নয়, পাঠিকা। কারণ আজও বোধ হয় বাংলা উপন্যাসের জগতে বিশ্বসাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক অনুপস্থিত। বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, তার জন্যে লেখকের নিন্দিত বা অভিনন্দিত হওয়ার কথা নয়। আসল কথা, দেখতে হবে লেখক যেটা বলতে চেয়েছেন কতোখনি সেটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সাহিত্যের মানদণ্ডের বিচারে জোলা-বালজাক-হামস্যুন-সঁগা-কুপরিণ বিশ্বসাহিত্যের অতি উচ্চস্থান অধিকার করেন, নীতির মানদণ্ড দিয়ে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিকে বিচার করবে এমন অর্বাচীন বোধ হয় আজ আর কেউ নেই। মানে থাকা উচিত নয়, কিন্তু আছে। আজকার দিনে কোনো মর্ত্যমানবতাবাদী সমাজ-সচেতন লেখক জলটুঙ্গী ঘরে আশ্রয় নিতে চান না তাই জীবনের সত্য ও সাহিত্যের সত্যের সমন্বয় সাধনে দ্বন্দ্বটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। চিরাচরিত নীতির ভাবধারাকে অস্বীকার করা কখনোই perversion নয়।

অবশেষে। যে সকল বন্ধুদের উৎসাহের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন, শ্রীমতী অমিতা সেন, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী রেণু দত্ত, শ্রীমতী লাবণ্য ঘোষ, রিসার্চস্কলার নরেশচন্দ্র জানা, শ্রীউমা প্রসাদ গুপ্ত, শ্রীসলিল সিংহ এবং শ্রীশংকরলাল রায়।

এঁদের সঙ্গে লেখকের যে সম্পর্ক সেটা সামাজিক সম্বন্ধের ঊর্দ্ধে, সুতরাং মামুলি ভাবে ঋণ স্বীকার অবান্তর। দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীপরেশ নাথ চক্রবর্ত্তীর উদ্যম প্রশংসনীয়। সাবধানতা সত্ত্বেও বহু মুদ্রণত্রুটি থেকে গেল এই সংস্করণে। অলমিতি।

গোয়ালটুলি রোড,<br>
চুঁচুড়া,<br>
হুগলী<br>
১৫. ১. ১৩৬৮

বিশ্বনাথ ঘোষ

উৎসর্গ

অশোক-এ

আমার সোনামণি সোনাভাই যে মোর অকালে হারায়ে গেছে মরণের অন্তহীন মৌনীঅন্ধকারে চিরতরে আজ তারই কথা শুধু মনে পড়ে বারে বারে।

No artist is ever morbid. The artist can express everything. There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well wtitten, or badly written. That's all.

—Oscar Wilde.

এই লেখকের

তারারা তিমির নয়

( আশু প্রকাশিতব্য )

এই পৃথিবী মিছিল নগরী

(প্রকাশিতব্য )

# পৃথিবী বিশাল

## ( এক )

হুগলী।

গগনস্পর্শী অভীপ্সা আর অতলস্পর্শী রহস্যের সে এক জীবন্ত বিগ্রহ।

'The chief keep of the Portuguese.'

পর্তুগীজ সৃষ্টি, কৃষ্টি এবং রক্তাক্ত ব্যভিচারের সে এক উদ্ধত বনিয়াদ। আকাশে বাতাসে পর্তুগীজ জলদস্যুর অশরীরী প্রেতাত্মা এখনো কেঁদে কেঁদে ভেসে বেড়ায়। বিরাট বিরাট প্রাকার প্রাসাদ আকণ্ঠ তৃষ্ণা আর অনন্ত অতৃপ্তি নিয়ে যোগভ্রষ্ট, রক্তচক্ষু ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর মতো আজো জেগে আছে ক্ষুধিত পাষাণ। স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা আশ্চর্য্য সে এক রূপকথার দেশ। তুমি তাকে দেখেছ কি বন্ধু? নিশিথরাত্রে শুনেছ কি তার রক্তমৃত্যুর কান্না? কায়াহীন কবন্ধ আত্মার সেই নীরব কোলাহল?

বিষণ্ণ প্রহরীর মতো সভ্যযুগের সজাগ সাক্ষী হয়ে কালের গলিতগর্ভে সে অভিশপ্ত প্রহর গণনা করছে। চটকলে ভরা ধূমেল ধুসর ব্ল্যাককান্ট্রি নটিহাটির পাশে রেনট্রি কান্ট্রি।

ইতিহাস বলে, আমি ভুলিনা। সে কাল—সে মহাকাল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দকে ইতিহাস ভোলেনি। নয়খানি রণতরী নিয়ে সামপায়ো গঙ্গাপথে কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটি ছাড়িয়ে, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দুর্য্যোগের ঘনঘটা পেরিয়ে, অনেক যুগের ওপার হতে, উত্তরে এগিয়ে আসতেই চোখে পড়ল আশ্চর্য্য স্বপ্ন-সুন্দর এক গ্রাম। কর্ণধার তরণী নোঙর করল। অচিরকালেই সেখানে কুঠি স্থাপিত

হল। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গড়-দুর্গ গড়ে উঠল। রাঢ় বাংলার মানচিত্রে এক নতুন জনপদ চিহ্নিত হল। পর্তুগীজেরা বলত 'গোলিন' পরে হল হুগলী। বাংলা মায়ের বিউটি স্পট। সাহেব-বিবি গোলামের দেশ—বাদশা-বেগম বণিকের যুগ।

'The synsure of neighbouring eyes.'

মহানগরী থেকে খুব বেশী দূর নয়—কলকাতার কাছেই। হোগ্‌লার বনকেটে বসত হল। আদিম অরণ্যের বুকচিরে পিঙ্গল বণিক একদিন এখানে সভ্যতা করল। নগর গড়ল। বন্দর উঠল। পর্তুগীজেরা বলত ব্যাণ্ডেল যার অর্থ বন্দর। বর্ণবিদীর্ণ গোধূলিতে বর্ণ-বিচিত্র নিশান উড়িয়ে রাজপুত্রের ময়ুর-পঙ্খীনাও সেখানে ভিড়ল। সপ্তডিঙ্গায় চড়ে কিশোরকুমার কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে বন্দরে এলো রূপবতী যশোমতী রাজকন্যার খোঁজে। দেশদেশান্তর থেকে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে সওদাগর এলো তার পণ্যবাহী তরণী নিয়ে। সাতসাগরের সীমানা পেরিয়ে আসা সঙ্গীণধারী দুরন্ত দুঃসাহসী বিদেশীদের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত দ্বিধামন্থর পদসঞ্চারে আকাশ বনানী দিগন্ত মন্ত্রিত হয়ে উঠল। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে বন্দরে প্রাণ-চাঞ্চল্যের মানস-হংস গতির ছন্দে পাখা মেলে নেচে উঠল। পর্তুগীজ জলদস্যুর ভীষণভয়াল কাপালিক অট্টহাসি আর যুযুধানী কোলাহলে সপ্তগ্রাম থেকে হুগলী চুঁচড়োর মাটি কেঁপে উঠল। মগ আর মোগল, ওলন্দাজ আর মোগলের গোলন্দাজ বাংলাকে ছারখার করছে। বার বার শত্রু হানা দিচ্ছে। সুস্থজীবন বিপজ্জনক হয়ে উঠলো। 'সমুখে পাঠান ডাইনে মোগল, মগেরা এসেছে বাঁয়, দুটি হাত তবু তিনেরে রুখেছে একাসে প্রতাপরায়,।' কোথায় সে প্রতাপরায়? কোথায় ভূষণার ভূঁইয়া রাজা সীতারাম? সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? সমর-সাগর-প্লাবন-পীড়নে মুখরিত হয় হিরণ্ময় বাংলার দিকচক্রবাল। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে কোন্ এক অশরীরী অপদেবতার

স্বাহুদণ্ড স্পর্শে আলোঝলমল বন্দরের হাজার রূপোপজীবিনী জেগে উঠত। তুরন্ত যৌবনের উন্মাদ দেহ-সম্ভোগের অতলান্ত গভীরতায় নদী-মেঘলা নগরীর কামনা-উদ্দাম কবোষ্ণ রাত্রি প্রভাত হোত। বেহুঁস-বেহেড় মাতালের মত্ত হুহুঙ্কার আর ব্যাভিচারিণীর বিভীষণ বীভৎস চিৎকারে নগরীর নৈশ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যেতো। সেই ভৌতিক চিৎকারের ভয়াবহতায় অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো নিষ্পাপ ঘুমন্ত কুমারী মেয়ে শিউরে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরত।

ভাঙ্গা বন্দরে আজ আর সে হাজার রূপোপজীবিনী মেলেনা। বন্দীর বন্দনায় দিকচক্র মুখরিত হয়না। সপ্তসমুদ্রের তুঃসাহসী নাবিক সেখানে ভেড়ে না। অপসৃয়মান ক্লিন্ন অতীতের সে অগৌরব তার নেই। আজকার বালুপথে হারিয়ে যাওয়া মরানদী সরস্বতী সেদিন বর্ষিয়সী রূপসীর পৃথুল দেহের মতো তার কুলপ্লাবী মোহানায় সহস্র সহস্র রণতরীকে আশ্রয় দিয়েছিল। ইতিহাসের পাতা উল্টে মাত্র তুশো বছর পূর্বে চোখ ফেরালে দেখা যাবে বণিকের নির্মোক-ধারী বিদেশী দস্যুদের মশালে হুগলীর নিবিড়-নিশীথ আকাশের ভালে আগুন ফুটে উঠেছিল। অনল নিঃশ্বাসীরথে একদিন যারা এলো, কালের তুর্লঘ্য বিধান আর নিয়তির নিষ্ঠুর তুঃশাসনে তাদের রাজচ্ছত্র ভেঙ্গে পড়ল, রথচক্র খুলে পড়ল, রণডঙ্কার শব্দ ক্ষীণতর হয়ে দূরদিগন্তে মিলিয়ে গেল। বিভ্রান্ত কালের বিমূঢ় জয়স্তম্ভ তার অর্থ ভুলে গেল। এইতো কালের ভ্রূকুটি কুটিল গতি। কিন্তু এরা যে শুধু ধ্বংস, মৃত্যু আর মহামারী ছড়িয়ে গিয়েছিল এই অপবাদের মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ এই মনোলোভা মনোরম জনপদ। স্থাপত্যের মিনারচুম্বী বিজয়কেতন। হুগলী চুঁচড়োর গোড়াপত্তনের মূলে রয়েছে ভাস্কোডাগামার উত্তরপুরুষের অক্লান্ত সাধনা। ভস্মাবশেষ অতীতের দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে ভগ্নাবশেষ শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করে স্নিগ্ধতোয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গার বুকে হাড়গোড়ভাঙ্গা-দ-য়ের মতো হেলে দাঁড়িয়ে আছে হুগলী।......

ইতিহাসের এক টুক্‌রো ছেঁড়া পাতা বাতাসে ভাসতে ভাসতে উড়ে এলো...কোম্পানির আমলের মধ্যভাগ। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন পাকাপোক্তভাবে দেশের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে গেছে। তখনো রাজশক্তি কোম্পানীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়নি। তখনো বিদ্রোহী সিপাহীদের তাজা খুনের দলা দলা রক্তে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের মাটি রক্তাক্ত হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে করাল অরাজকতার মহড়া চলেছে। শিবণের গিরিদুর্গে বসে বালক শিবাজী এক অখণ্ড মহাভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় পানিপথের রণাঙ্গণে দুরাণীর হাতে শিবাজীর অস্থি ও মজ্জা স্বপ্ন ও সাধনা দিয়ে গড়া মারাঠাশক্তি ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়েছে। উত্তর ভারতে কেশ কাঙ্গা কাচ্ছা নিয়ে নবজাগ্রত বলিষ্ঠ শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়েছে। বহিঃ পৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাতে বাংলার বিকলাঙ্গ সমাজ জীবনে চিড় ধরেছে। যুগ সংকটের ঝঞ্ঝাবাত্যার প্রবল আঘাত-সংঘাতে জাতীয় জীবন টলমল করছে। বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ-সংক্রান্তির সে এক দারুণ দুর্দ্দিন। সে অনেকযুগ আগের কথা। যজ্ঞ করবার জন্য বাংলা দেশে পাঁচজন সৎব্রাহ্মণ আনলেন আদিশূর। কৌলিন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে বাংলার সমাজজীবনকে বন্দী করলেন বল্লাল সেন। চারিদিকে বড় গোল। কুলীনের ঘরে ছেলে পাওয়া যায় না। বড় বেশী চাহিদা। কুলীন ব্রাহ্মণ বংশজের হাতে মেয়ে দিতে চায় না। অনুলোম বিবাহ হিন্দু সমাজ অনুমোদন করে না। ক্রমে এমন এক অবস্থা, মানে দুরাবস্থা এসে দাঁড়ালো সে পাত্রের অভাবে কুলীনের মেয়ের বিয়েই হয় না। আর চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় কুলীন পাত্রের অনায়াসেই কয়েককুড়ি জুটে যায়। স্বামীসহবাসে বঞ্চিতা সধবা কুলীনকন্যাদের অনেকেই অবৈধ্য উপায়ে, নীতিবিগর্হিত পথে মাতৃত্বের অধিকার লাভ করেছেন। ক্ষুধানিবৃত্তির সময় জাত ধর্ম

কুলমান বিচার থাকে না। দালালেরা ছোট জাতের সুন্দরী মেয়েটা বংশজ পাত্রের কাছে চড়া দামে বিক্রয় করার মোকায় জীবিকা অর্জনের এক নতুন পথ পেয়ে গেছে। সমাজের সকল স্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি এসে বাসা বেঁধেছে। বাবুগঞ্জের ভট্টাচার্য্যদের মেয়ে বিন্দুবাসিনী। সার্থকনাম। আগুনের মতন রূপ। একবার চোখ দিয়ে তাকালে চোখ ঝল্‌সে যায়। এমন রূপসী মেয়েও একান্ত করে আপন স্বামী পেল না। ন বছর বয়সে গৌরী দান হয়। বিয়ে হয়েছিল ভাটপাড়ার এক নামকরা ভট্টাচার্য্য পরিবারের ছেলে হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে। হরিনারায়ণ টোলের পণ্ডিত। অধ্যাপক। সন্ধি-সমাস কণ্টকিত দীর্ঘ দুরূহ বাক্য ব্যবহার করেন। শব্দের সঙ্গে অনুস্বার বিসর্গ যোগ করে কথা বলেন। মাথায় পুষ্প চন্দন মাখানো সুদীর্ঘ শিখা। গায়ে উত্তরীয়, পায়ে খড়ম। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে এক কন্যাদায়গ্রস্ত সৎব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবার জন্য হরিনারায়ণ বিন্দুবাসিনীকে বিবাহ করলেন। ইতিপূর্বে তিনি ছয় সংসার করেছেন, বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে বিবাহের পরও তিনি আরও চারজন কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন ব্রাহ্মণের কুল রক্ষা করেন। সতীনদের জ্বালায় আর চরিত্রহীন স্বামীর দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারে বিন্দুবাসিনী চোখের জল মুছতে মুছতেএক আঁধার রাতেনৌকাযোগে পিত্রালয়ে ফিরে এলো। তখন বিন্দুবাসিনীর বয়স মাত্র দশ বৎসর। এরপর কখনো স্বামী তার খোঁজখবর নেয়নি, বিন্দুবাসিনীও শ্বশুর বাড়ী ফিরে যায়নি। ক্রমে কৈশোর অতিক্রান্ত যৌবনের নিঃশব্দ পদক্ষেপে তার সারা শরীর দলমল করে উঠল। মনে জেগে উঠল রক্তমাংশের সম্ভোগেচ্ছা। ক্ষুধা আছে কিন্তু খাদ্য নেই। তৃষ্ণা আছে, তৃপ্তি নেই।

এক দুর্যোগসংক্ষুব্ধ সন্ধ্যায় পর্তুগীজ জলদস্যু ডেমিনিক ডি সুজা দ্রুতগামী সাম্পানে করে ত্রিবেণী থেকে চুঁচুড়ায় ফিরছিল। বকুলতলার ঘাটের কাছে আসতেই সে সহসা দেখল এক অপরূপা

রূপলাবণ্যবতী রমণী ঘাট থেকে কলসী ভরে জল নিচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। চারিদিক জঙ্গল। সাম্পান তীরে ভিড়িয়ে কেনারায় লাফিয়ে পড়ল ডেমিনিক ডি. সুজা। পর্তুগীজ জলদস্যু দেখে বিন্দুবাসিনী ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু এখান থেকে চিৎকার করে কোনো লাভ নেই। ফল বিফলে যাবে। যা নৃশংস এই দস্যুগুলো। হয়ত এক ভোজালির টানে নাড়িভুঁড়ি বার করে দেবে। কিন্তু না, না প্রাণে মরতে চায় না বিন্দুবাসিনী। যৌবন এখন তার দেহের কানায় কানায়, সম্ভোগস্পৃহা শিরায় শিরায়। তার পরিবর্ত্তে সে তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে। ডি. সুজা তাকে কোলে করে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। বিন্দুবাসিনীকে সর্ব্বস্ব দিতে হল। প্রথমে নারীসুলভ একটু আপত্তি জানিয়েছিল বিন্দুবাসিনী। কিন্তু তারপর কেমন যেন তার ভালই লেগেছিল। একটা নতুন জীবনের আস্বাদন, একটা দ্বিতীয় সম্ভাবনার ইংগিত পেল বিন্দুবাসিনী।

কিছু দিন পরে পাড়াব সবাই জানল বিন্দুবাসিনী পুত্রসম্ভবা। শুনে পাড়ার কামিনীদিদি বললেন, হ্যাঁরে, বিন্দু, তোর নাকি শুনছি হবে?

বিন্দু শুধু একটু সলজ্জ হাসি হাসল। যার অর্থ হ্যাঁ।

—হ্যাঁরে, তা'হলে কত্তা তোর প্রতি পেসন্ন হয়েছে, আজকাল মাঝে মাঝে আসছে? তা' তো হবারই কথা, সোমত্ত হয়েছিস, এখন তোর রূপ খুলেছে, দেহে যৌবনের জোয়ার এসেছে, এখন তো আর ন বছরের কচিখুকীটি নস। একবার দেখলে চোখ ফেরায় সাধ্যি কার? তা কবে এসেছিল জানলাম না তো?

—মাঝে একদিন রাত্তিরে এসেছিল, ভোরে চলে যায়। অম্লান মুখে বলল বিন্দুবাসিনী।

—মোটে একরাত্তির এসেছিল? তাতেই—এ্যাঁ—বলিস কি—মরণ আর কিলা!

যথাসময়ে বিন্দুবাসিনী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। দেবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। নিষ্ঠাবান কুলীন ভট্টাচার্য্যবংশের আদি পিতৃপুরুষ। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা শেষ হয়ে গেল।···

আহ্নিকগতি আর বার্ষিকগতির ধাক্কায় ধাক্কায় গড়িয়ে চলে পৃথিবী। পৃথিবীর রূপ বদলাচ্ছে। সামন্ততান্ত্রিকতার ধ্বংসাবশেষের উপর শিল্প সভ্যতা জেগে উঠছে। হুগলী আজ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল শহরের আকার নিচ্ছে। হুগলীর আশেপাশে গড়েউঠছে মিল কল-কারখানা। আর এদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শিল্পের সমৃদ্ধি। অনেক দূর থেকে—মরাগ্রামের বুক থেকে ছুটে আসছে মানুষ। বিরাট বিরাট চিমনি গড়ে উঠছে আর তার তলায় জ্বলন্ত ব্লাস্টফার্ণেস। সেখানে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে হেটো মানুষের ঘামে ভেজাশিরাবহুল কালো কালো কেটো আর মেটো হাত। বৈশ্য সভ্যতার উদ্ধত জেহাদ সুরু হচ্ছে। মানুষের রক্ত ঘাম আর চোখের জল বাষ্প হয়ে চিম্‌নি দিয়ে দূর আকাশে উঠে অনেক দূরে সারাপৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

ছন্দে ছন্দে পৃথিবীর রং বদলায়।···

পোর্টো গ্রান্দে হুগলী। অতীত আর বর্ত্তমানের স্মরণীয় সেতুবন্ধনে পৃথিবী বিশাল। এই বেগবতী তটিনীর মেঘবতী জনপদের এক কেশবতী কিশোরী কন্যাকে নিয়ে আমাদের কাহিনীর সূত্রপাত।

* * *

বাবুগঞ্জ হুগলীর দক্ষিণপূর্বের একটি বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চল। যদিও জায়গাটির নামের পিছনে গঞ্জ জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আসলে কিন্তু সত্যসত্যই এটা গঞ্জ নয়। এখানে হাটও বসে না, বাজারও হয় না। পাড়ার পূর্বদিক দিয়ে বহে গেছে পুণ্যবাহিনী শাখানদী উপনদী গঙ্গা। আর পশ্চিম সীমান্তে পিপ্পলগাছে ভরা পিপুলপাতি। এ অঞ্চলের হাড়কাটা গলি। দশবছর আগে পিপুলপাতির যে কুখ্যাতি ছিল সভ্যতার বিবর্ত্তনে আজ অবশ্য সেটা প্রায় লোপ

পেয়েছে। বিকৃত ক্ষুধায় বন্দিনী সেই সব পণ্যাঙ্গনাদের আজ আর দরজায় দরজায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বিড়ি টানতে দেখা যায় না। ইম-প্রুভমেন্টট্রাস্টের চাকার তলায় সামন্ত সভ্যতার এ কলঙ্ক মুছে যাচ্ছে। আজ সেই পতিতা পল্লীর ধ্বংসস্তূপেরউপর বিপুল বিস্তৃতিআর বিশাল আয়তন নিয়ে হুগলী মহিলাকলেজ সগৌরবে তার চিত্তহারিণী অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। রক্তরঞ্জিত মৃতদেহ থেকে রক্তাক্ত হৃদয়ের জ্বালা নিয়ে ফুটে উঠেছে রক্তকমল। বিগত দশ বছরে পিপুলপাতি কৃকলাসের মতো তার রং বদলে ফেলেছে। তার রূপ পরিবর্ত্তন হয়েছে। বিকৃতি আর প্রকৃতির মধ্যদেশে এই বাবুগঞ্জ। জীবিকার গ্লানির মাঝেও দেখা যায় গতিশীল জীবনের অস্তিত্ব।

—এই শোনো—

জামতলা পার হয়ে পথ সংক্ষেপ করে ছেলেটি স্কুলে যাচ্ছিল। ডাক শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাড়ার শেষে রাস্তার পাশে যে বাঁশঝাড়টি ছিল তার অন্তরাল থেকে একটি ফ্রকপরা কিশোরী মেয়ে বেরিয়ে এলো। ছেলেটি অবাক হয়ে মেয়েটিকে দেখল। মেয়েটির চোখে মুখে সপ্রতিভ সাবলীলতা। দু'হাত ভর্ত্তিকুল আর পেয়ারা। মেয়েটি কাছে এসে ছেলেটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কোমরে একটী হাত রেখে গিন্নীপনার সুরে বলল, তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি! তুমি বুঝি এ পাড়ায় নতুন এসেছ?

—হ্যাঁ, মাত্র কয়েকদিন হল আমরা এখানে এসেছি।

—এখানে কাদের বাড়ী এসেছ শুনি? মেয়েটি একটি কুলে কামড় দিয়ে প্রশ্ন করল।

—ওই যে পাড়ার পশ্চিমে শেষ ভাঙ্গা বাড়ীটা দেখছ—ওটাই—আমার দাদুর বাড়ী—ওখানেই থাকব বলে আমরা এসেছি।

—আমরা মানে? মেয়েটি ভ্রূকুঞ্চিত করল।

—আমি আর আমার মা।

—ও হরি তাই বল! তুমি শান্তিমাসীর ছেলে! আর তোমায়

কিচ্ছু বলতে হবে না, আমি সব বুঝে নিয়েছি। শান্তি মাসীর বর মারা গেছে—শ্বশুর বাড়ীতে খেতে দেবার মতো কেউ নেই, তাই তোমরা এখানে এসেছ। আমি কাল মায়ের কাছে সব শুনিছি। তোমরা যেদিন দুপুরবেলায় পোঁটলাপুঁটলী নিয়ে এলে, সেদিন তোমাদের বাড়ীতে খুব কান্নাকাটি হয়েছিল—পাড়ার সবাই গিয়েছিল, আমি যে ছিলাম না তখন—পিশিমার বাড়ী শ্রীরামপুরে গিয়েছিলাম, সবে কাল এসেছি—তা' না হলে আমিও তোমাদের বাড়ী যেতাম। আচ্ছা তুমি খুব কেঁদেছিলে সেদিন ?

—হ্যাঁ, কেঁদেছিলাম বৈকি।

—তোমরা কি জাত ? মেয়েটি প্রশ্নের মোড় ফিরিয়ে দিল।

—ব্রাহ্মণ।

– কুলীন না বংশজ ? ভারিক্কি চালে মেয়েটি প্রশ্ন করল।

—অতোশত জানি না।

—জানো না যখন তখন বংশজই হবে। আমরা নৈষ্ঠিক বৈদিক কুলীন ব্রাহ্মণ। বাবুগঞ্জের ভট্টাচার্য্যদের নাম কেনা জানে ? তোমার নাম কি ? মেয়েটি আর একটি কুল মুখে পুরল।

—যুবনাশ্ব—যুবনাশ্ব লাহিড়ী।

—কি বিচ্ছিরি দাঁতভাঙ্গা নাম বাবা! আমার নাম শ্রীমতী সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য্য। মনে থাকবে তো? শ্রীমতী—সুরঞ্জনা—ভট্টাচার্য্য।

মেয়েটির কথাবার্ত্তার ধরণধারণ আর পাকামী দেখে যুবনাশ্ব হেসে ফেলল।

—হাসলে যে বড় ? শাসনের ভঙ্গীতে সুরঞ্জনা কাছে এগিয়ে এলো।—এমনি !

—একটি উজবুক তুমি। তোমার হাতে তো বেশ মোটামোটা বই দেখছি—কোন ক্লাশে পড় শুনি ?

—ক্লাশ টেন।

—তোমার বয়স কতো ? অবলীলায় সুরঞ্জনা জিজ্ঞাসা করল।

—ষোল।

বর্ষিয়সীমহিলার বিজ্ঞতা কণ্ঠে ঢেলে সুরঞ্জনা বলল, সবাই আসল বয়স লুকিয়ে কম করে বলে, তুমি কতো কমিয়ে বলছ শুনি?

—কমিয়ে না, ঠিকই বলছি।

—তোমার ষোল, আমার পনেরো—তুমি আমার চেয়ে মাত্তর এক বছরের বড়, তোমায় নাম ধরেই ডাকব। আমি কিন্তু কোন্ ক্লাশে পড়ি জানো? মোটে ক্লাশ সেভেনে—তাও আবার এ বছর ফেল করেছি। আবার যদি এই ক্লাশে ফেল করি হেড মিষ্ট্রেস তাহলে আমার নাম কেটে দেবে বলেছে। ভারী পাজী বড়দিদি-মণিটা। মা খুব বকাবকি করেছে—ম্যাট্রিক পাশ না করলে আজকাল ভালো বর পাওয়া যায় না।

সুরঞ্জনার অকপট সরলতায় যুবনাশ্ব মুগ্ধ হয়ে গেল। হেসে বলল, জানোই যখন যে ম্যাট্রিক পাশ না করলে ভালো বর পাওয়া যায় না, ভালো করে পড়াশুনো করনা কেন?

—বারে পড়িনা যেন! পড়ি তো খুব—মাইরি বলছি। কিন্তু বুঝতে পারি না যে। বিশেষ করে অংক—ওরে বাব্বা! ওর কথা শুনলে গায়ে জ্বর এসে যায়। মা বলে তোর মাথায় গোবর পোরা আছে, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তুমিই বল সত্যি করে, মাথায় বুঝি কারো গোবর থাকে?

যুবনাশ্বের ভারী মজা লাগল। স্মিত হেসে সে বলল, পড়াশুনোয় যখন অসুবিধা হয়, মাষ্টার রেখে পড়না কেন?

—বারে আমরা যে খুব গরীব লোক—মাষ্টার রাখবার মতো পয়সা কোথায় পাবো? দাদা কলকাতা থেকে মাসে মাসে ষাট টাকা করে পাঠায় তাতেই কোনো রকমে সংসার চলে। বাব্বা! যা জিনিষ-পত্রের দাম আজকাল! তোমার মতো আমারও বাবা নেই। বেশ ভালই হয়েছে—তোমারও বাবা নেই আমারও বাবা নেই।

—আচ্ছা সুরঞ্জনা, তুমি যখন পড়া বুঝতে না পারবে তখন আমার কাছে এসো, আমি তোমায় অংক ইংরিজি সংস্কৃত সব বুঝিয়ে দেবো।

—দেবে তো, ঠিক বলছ? এই নাও একটী পেয়ারা খাও। ওইযে পঞ্চু মোড়লের বাগান রয়েছে লালদীঘির পাশে সেখান থেকে চুপিচুপি পেড়ে এনেছি। বেশী নয়, মাত্তর চারটে—মাইরি বলছি। এই নাও, তোমার আবার স্কুলের দেরী হয়ে যাবে।

যুবনাশ্বের হাতে পেয়ারা একটি গুঁজে দিয়ে যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি অকস্মাৎ সুরঞ্জনা বাঁশগাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। যুবনাশ্ব বেশ কিছুক্ষণ মেয়েটির গমনপথের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি স্কুলের দিকে পা বাড়াল! সুরঞ্জনার দেওয়া পেয়ারাটি যত্নসহকারে পকেটে রেখে দিল। স্কুল থেকে ফিরবার পথে যুবনাশ্ব সেই বাঁশ তলায় এসে চলার গতি মন্থর করে দিল। মনের অভিলাষ আবার যেন সেই কিশোরী সুরঞ্জনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাক। কিন্তু সত্যসত্যই সুরঞ্জনার আর সাক্ষাৎ মিলল না। এই জলোচ্ছ্বল জনপদের কলোচ্ছ্বল, প্রাণোচ্ছ্বল, হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটির দেখা পাওয়া গেল না আর। রাত্রে খেতে বসে যুবনাশ্ব একথা ও কথার পর মাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মা, সুরঞ্জনা বলে এই পাড়ায় একটি মেয়ে থাকে—তুমি চেনো তাকে?

—আঙ্গুরদির মেয়ে সুরোর কথা বলছিস? হাঁ চিনি, কিন্তু কেনরে খোকা? মা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

—আজকে স্কুলে যাবার পথে ওর সঙ্গে দেখা হল, ও আমায় একটি পেয়ারা দিল।

মা সহসা গম্ভীর হয়ে বললেন, আর কি করল?

—আমি কোন ক্লাশে পড়ি, কি নাম, কবে এসেছি, কাদের বাড়ী এসেছি, কি জাত এই সব খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করল।

—এই কদিন মাত্র এখানে এসেছিস, এরই মধ্যে মেয়েদের সঙ্গেও তোর ভাব হয়ে গেল খোকা ?

—বারেঃ, সব তাতেই তুমি আমার দোষ দেখো। আমি তার সঙ্গে ভাব করতে গেলাম কখন, সে-ই তো আমায় ডেকে সব জিজ্ঞেস করল, যেচে কথা বলল, পেয়ারা খেতে দিল।

গম্ভীর গলায় মা বললেন, দেখো, কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবেনা—বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে—এতে চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে, তাতে পড়াশুনোর ক্ষতি হয়। ভুলে যাও কেন তুমি অসহায় বিধবার একমাত্র সন্তান, তোমার কিছু নেই, মাথার উপর কেউ নেই। সর্বদাই মনে রাখবে তোমায় দশজনের একজন হতে হবে—মানুষের মতো মানুষ হয়ে দাঁড়াতে হবে।

যুবনাশ্ব ঘাড় হেঁট করে অপরাধীসুলভ ভঙ্গীতে খেয়ে উঠে গেল। মায়ের কঠিন কঠোর মুখের দিকে তাকাতে তার ভয় লাগে।

বেশ কয়েকদিন পরের কথা। প্রভাত-সূর্য্য সবে দেখা দিয়েছে। কুহেলীমলিন সকালবেলায় যুবনাশ্ব নিবিষ্টচিত্তে পড়ছিলো। খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে ধূমকেতুর মতো সুরঞ্জনার আকস্মিক আবির্ভাব হল। বিনা ভূমিকায় খাতাখানি যুবনাশ্বের মুখের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, অংকটা করে দাও।

আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই সুরঞ্জনা নিশ্চিত ভঙ্গীতে যুবনাশ্বের পাশে বসে পড়ল। যুবনাশ্ব পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সুরঞ্জনাকে দেখল। আজ আর সে ফ্রক পরে আসেনি। একটা আটপৌরে ডুরে সাড়ী সুরঞ্জনার পরিধানে।

—হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছ ? অংকটা তাড়াতাড়ি করে দিতে বললাম না ? হ্যাদারাম আর বলে কাকে !

সুরঞ্জনার ধমক খেয়ে যুবনাশ্বের চমক ভাঙ্গল। সে লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি সুরঞ্জনার খাতাখানি টেনে নিল। কোনো জটিলতা ছিল না। অতি সাধারণ, সহজ সরল অংক। এক নিমিষের

মধ্যে অংকটি করে যুবনাশ্ব খাতাখানি ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এই নাও।

যুবনাশ্বের আঙ্কিক দক্ষতা দেখে সুরঞ্জনার শ্রদ্ধাপ্লুত বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। মুখে বলল, আমি নিয়ে কি করব? বুঝিয়ে দাও কেমন করে করলে।

যুবনাশ্ব অংকের পদ্ধতি সুরঞ্জনাকে বুঝিয়ে দিল। কিন্তু মাথামোটা সুরঞ্জনা কিছুতেই বুঝতে পারে না। উপর্য্যুপরি বারকয়েক বিফল হয়ে হতাশকণ্ঠে যুবনাশ্ব বলল, তুমি একেবারে hopeless সুরঞ্জনা—তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

—না হয় না হবে, তাতে তোমার কি? আমার খাতা দাও, খুব মাষ্টারী করা হয়েছে। এক ঝট্‌কায় যুবনাশ্বের হাত থেকে খাতাখানি ছিনিয়ে নিয়ে সুরঞ্জনা দ্রুতপায়ে ঘরথেকে বেরিয়ে গেল।

সুরঞ্জনা এমনভাবে চলে যাওয়ায় যুবনাশ্ব অনুতপ্ত হল। মনেহল সুরঞ্জনাকে ওকথা বলা তার উচিত হয়নি।

যুবনাশ্বের পাশে চায়ের কাপটি সযত্নে বসিয়ে দিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন, কার যেন গলা শুনলাম, কে এসেছিল রে খোকা?

—সুরঞ্জনা এসেছিল মা। ও একটা অংক দেখিয়ে নেবার জন্যে এসেছিল, কিছুতেই বোঝান গেল না। ওর এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

—পাড়ার এতোলোক থাকতে সুরো তোর কাছেই এলো—তুই বুঝি ওকে আসতে বলিছিলি?

—হ্যাঁ মা। ও গত বছর ফেল করেছে আর এবছর যদি আবার ফেল করে তাহলে হেডমিষ্ট্রেস ওর নাম কেটে দেবে। ওরা আমাদের মতোই গরীব, তাই আমি ওকে বলেছিলাম পড়া বুঝতে অসুবিধা হলে আমার কাছে এসো।

—হুঁ। পরদুঃখকাতরতা মহানুভবতার লক্ষণ সন্দেহ নেই কিন্তু লেখাপড়া আর সমাজসেবা দুটো একসঙ্গে হয় না বাবা। তুমি পড় এখন।

মা চলে গেলেন। সেদিন অবশ্য যুবনাশ্বের পড়ায় এতটুকু মনসংযোগ হল না। সোজা অংকও বারবার ভুল হয়ে যেতে লাগল। বিরক্ত হয়ে যুবনাশ্ব অংকের খাতা দূরে ঠেলে দিয়ে ইংরাজী বই খুলে বসল। কিন্তু মন বসল না। কোন পদ্ধতির শিকল দিয়েও মৃগমনকে শৃঙ্খলিত করা গেল না। সুরঞ্জনার কথাই কেবল ঘুরে ফিরে বারে বারে মনে আসতে লাগল। ভালভাবে চিন্তা না করে মুখের উপর সরাসরি তার একটা যা তা বলা উচিত হয় নি। মেয়েটিও কেমন যেন একগুঁয়ে, অবাধ্য, গোঁয়ার। একটুতেই রেগে যায়, তুচ্ছ কারণে ক্ষেপে ওঠে। যুবনাশ্ব মনে মনে স্থির করল সুরঞ্জনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। স্কুলে যাবার অথবা ফেরবার পথে সুরঞ্জনার সঙ্গে দেখা হল না। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাদের বাড়াটা জেনে ফেলেছে কিন্তু বাড়ী গিয়ে ডেকে কথা বলবার মতো দুঃসাহস এখনো তার হয়নি।

পরের দিন রবিবার। সারা সকাল প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা নিয়ে যুবনাশ্ব কামনা করল গতকালের মতো সুরঞ্জনা আজও যেন তার কাছে অংক করতে আসে। কিন্তু সে এলোনা। বেলা বাড়তেই যুবনাশ্ব লালদীঘিতে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর দীঘিতে স্নান করবার অনুমতি মা দিয়েছেন। পাশের বাড়ীর সুশীলা পিসির সাথে সে যাবে। আজকার স্নানটা হবে স্মরণীয়। গামছা কাঁধে ফেলে সুশীলাপিসির পিছু পিছু বার হতেই মা সাবধান করে দিলেন, খোকা তুমি সাঁতার জানো না— মোটেই বেশী জলে যাবে না। সুশীলা পিসির কাছে কাছে থাকবে।
—আচ্ছা মা তাই হবে। যুবনাশ্ব মায়ের সামনে থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচে।

—আর পিসি, তুমি দেখো খোকা যেন জলে হুটোপাটি না করে।

—সে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।

সুশীলা পিসির পিছুপিছু যুবনাশ্ব লালদীঘিতে এসে উপস্থিত

হল। বিরাট দীঘি। এপার থেকে ওপার অস্পষ্টতায় ধূসর দেখায়। ঘাটে অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ স্নান করছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অগভীর জলে সাঁতার যতনা কাটছে জল ছিটকাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। দীঘির মাঝে চোখ পড়তেই যুবনাশ্ব দেখল সেখানে একরাশ শালুক ফুল ফুটে রয়েছে। আর কয়েকটি ছেলে মেয়ে সাঁতার দিয়ে সেখান থেকে ফুল ছিড়ে নিয়ে ঘাটের দিকে আসছে। আশ্চর্য্য যুবনাশ্ব দেখল যার কথা আজ তুদিন ধরে শুধুই ভেবেছে সেই সুরঞ্জনা তাদের দলের সর্বাগ্রে রয়েছে এবং দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে সুরঞ্জনাকে দেখে যুবনাশ্ব পুলকানুভূতিতে কেঁপে উঠল। ইতিমধ্যে সুশীলাপিসি তিনডুবে স্নান সেরে ফেলেছেন।

—কি রে খোকা, তুই এখনো জলেও নামিস নি? আমার যে চান হয়ে গেল।

—এতোবড় দীঘি কি কখনো কলকাতায় দেখেছি পিসি? দেখো দেখো পিসি সুরঞ্জনারা সব সাঁতার কেটে কোথায় গিয়েছিল —ভাবতেও আমার বুক শুকিয়ে যায়। তুমি যাও পিসি, আমি এখন ওদের সাঁতারকাটা দেখব।

—ওমা তোর মা যে আমায় বকাবকি করবে!

—কিছু করবে না পিসি, তুমি যাও। বুড়ো মানুষ, ভিজে কাপড় পরে দাঁড়িয়ে থাকলে সর্দ্দি ধরে যাবে তোমার! ঘাটে এতো লোক রয়েছে, আমি ডুববো না, তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

—ছেলেগুলো দিনদিন কি অবাধ্যই না হচ্ছে! একটা কথা যদি শোনে। গজগজ্ করতে করতে সুশীলা পিসি শেষবারের মতো স্মরণ করিয়ে দিল: দেরী করিস না যেন বাছা!

—না পিসি, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

সাঁতার দিয়ে সর্বপ্রথম ঘাটে এলো সুরঞ্জনা। মুখে একটা শালুক ফুল।

যুবনাশ্ব সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, সুরঞ্জনা তুমি ফার্স্ট হয়েছ—I congratulate you.

সুরঞ্জনাও দূর থেকে যুবনাশ্বকে দেখেছিল। অন্তরে পুলকিত হলেও বাইরে ভাবান্তর না দেখিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে যুবনাশ্বের দিকে তাকিয়ে বলল, কি ইংরিজি বললে—ওর মানে কি?

—তোমায় অভিনন্দন জানালাম সুরঞ্জনা।

—ওঃ! ঠোঁট উল্টে সুরঞ্জনা একটা অব্যয়ের বেশীকিছু ব্যয় করার প্রয়োজন বোধ করলনা।

—সুরঞ্জনা, তুমি ভাই এতো ভালো সাঁতার শিখলে কি করে? যুবনাশ্বের কণ্ঠস্বর অনুকরণে সুরঞ্জনা ব্যঙ্গ করে বলল, তুমি ভাই অতো ভালো অংক শিখলে কি করে?

—আঃ, আমি বুঝি ভালো অংক জানি? যুবনাশ্ব লজ্জিত হল।

—থাক আর ঢং করতে হবে না। আমি তোমায় সাঁতার শিখিয়ে দেবো—আমাকে কিন্তু অংক শিখিয়ে দিতে হবে।

প্রত্যুত্তরে যুবনাশ্ব কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা আর হল না। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে জলছিটকে হৈ হুল্লোড় করে ঘাটে এসে পড়ল। সবারই দুঠোঁটের ফাঁকে একটি করে সদ্যপ্রস্ফুটিত লাল শালুক ফুল।

—ভারী চমৎকার ফুল তো! যুবনাশ্ব একটি নৈর্ব্যক্তিক মন্তব্য করল।

—তুমি নেবে? এই নাও আমার ফুল। সুরঞ্জনার সমবয়সী একটি সুন্দরী সুদর্শনা মেয়ে তার ফুলটি যুবনাশ্বকে এগিয়েদিল।

যুবনাশ্ব ইতিপূর্বে পাড়ায় এমেয়েটিকে দেখেছে এবং মেয়েটিও যুবনাশ্বকে তার মায়াভরা ডাগর চোখ মেলে দেখেছে। মেয়েটির চোখে মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠ দীপ্তি এবং অহংকারের অগ্নিশিখা সমুদ্ভাসিত। যুবনাশ্ব ফুলটি নিতে যাবে এমন সময় সুরঞ্জনা এক কাণ্ড করে বসল।

—আমি ফার্স্ট হয়েছি, তুমি আমার ফুল নেবে—সুশোভনার ফুল তুমি ছোঁবে না বলছি—ও লাস্ট হয়েছে।

ততক্ষণে যুবনাশ্ব হাত বাড়িয়ে সুশোভনার ফুলটি নিয়ে নিয়েছে! সুরঞ্জনার কথায় থতমত খেয়ে সে বলল, বেশ তো আমি তোমার টাও নেবো আর সুশোভনারটাও নেবো।

সুরঞ্জনা রাগে চোখ মুখ লাল করে তার ফুলটা কুচিকুচি করে কুঁচিয়ে যুবনাশ্বের মুখের উপর সশব্দে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, নাও। তারপর দ্রুতপায়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। যুবনাশ্ব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সুশোভনার ফুল নিয়ে সে যে কি অন্যায় করেছে বুঝে উঠতে পারল না।

সুরঞ্জনা রাগ করে চলে যাওয়ায় সুশোভনা ভারী খুসী হল।

—তুমি সাঁতার জানো? সুশোভনা যুবনাশ্বকে শুধালো।

কণ্ঠস্বরে অন্যমনস্কতার অস্পষ্টতা এনে অস্ফুটস্বরে যুবনাশ্ব বলল, না।

—এসো, আমরা তোমায় শিখিয়ে দেবো। একটি ছেলে যুবনাশ্বের দিকে এগিয়ে গেলো।

—না ভাই, আজ থাক, অনেক দেরী হয়েছে, অন্যদিন সাঁতার শেখা যাবে। যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি কয়েকটা ডুব দিয়ে বাড়ী ফিরল।

আজ দুপুরে যেমন করে হোক সুরঞ্জনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। মিনতি করে তার মান ভাঙ্গাতে হবে। কথায় কথায় মেয়েটির রাগ আর অভিমান। যুবনাশ্ব তার সহজাত ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে অভিমান প্রবণ সুরঞ্জনার চরিত্র মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। সময় পেলেই সুরঞ্জনা পেয়ারা চুরি করবার জন্যে পঞ্চু মোড়লের বাগানে যায় এ তথ্য সুরঞ্জনাই যুবনাশ্বকে সরবরাহ করেছে। আজ রবিবার, স্কুলের ছুটি, দুপুরে সুরঞ্জনা নিশ্চয়ই পঞ্চু মোড়লের বাগানে যাবে। সেখানে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। প্রয়োজন হলে সুরঞ্জনাদের বাড়ীও সে যাবে। কিন্তু সুরঞ্জনাদের বাড়ী যাবার প্রয়োজন হল

না। মণ্ডলদের বাগানের কাছে এসে দেখা গেল সুরঞ্জনা নুন লংকা সহযোগে আর বিচিত্র শব্দসহকারে টক তেঁতুল খাচ্ছে। দূর থেকেই সুরঞ্জনা যুবনাশ্বকে চিনতে পেরেছিল কিন্তু না দেখার ভান করে নির্লিপ্তভাবে টক তেঁতুল খেয়ে চলল। বরং অকস্মাৎ যাওয়ার মনোযোগ বেড়ে গেল। আশেপাশে কেউ নেই দেখে যুবনাশ্ব সাহস সঞ্চয় করে সুরঞ্জনার পায়ের কাছে এসে বসল। অনাবশ্যক-ভাবে সুরঞ্জনা সাড়ীর আঁচলটা বার করে টানল, সরালো এবং সঙ্কুচিত হয়ে পা দুটো সরিয়ে নিয়ে অবশেষে বলল, এই, পায়ের কাছে বসে না—গায়ে পা লাগবে যে!

যুবনাশ্ব নড়লনা দেখে সুরঞ্জনা নিজেই সরে এসে যুবনাশ্বের পাশে গা ঘেঁসে বসল।

—এই নাও তেঁতুল খাও।

—আমি ওই টক তেঁতুল খাই না, তুমি খাও বেশী করে।

—তবে এই পেয়ারাটা নাও—

—একটা মাত্র পেয়ারা দেখছি!

—তা'হোক, এটা তুমি খাও।

কিশোরীমেয়ের এই মিনতি বিগলিত নিবেদন প্রত্যাখ্যান করবে কোন্ যুবনাশ্ব? যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার হাতে হাত ঠেকিয়ে পেয়ারা নিল। মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য, সকাল বেলার নাটকীয় ব্যাপার সুরঞ্জনা এরই মধ্যে ভুলে গেল? কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে যুবনাশ্বই পুনরায় পুরানো প্রসঙ্গ তুলল।

—সকাল বেলায় সুশোভনা ফুল দিলে তুমি অতো রেগে গিয়েছিলে কেন সুরঞ্জনা?

—বেশ করেছিলাম। তুমি সুশোভনার কাছ থেকে ফুল চাইলে কেন?

—এই দেখো! চাইলাম কোথায়, ওই তো আমায় যেচে দিতে এলো—কেউ কিছু দিলে না নেওয়াটা অভদ্রতা নয় কি?

—বেশ তো যাও না ওই সুশোভনার কাছে, কে তোমায় মাথায় দিব্যি দিয়ে আমার কাছে আসতে বলেছে শুনি ?

—উঃ কি ঝগ্‌ড়াটে মেয়ে বাবা ! ট্যাকট্যাকে কথা বল বলেই তো তোমার সঙ্গে পাড়ার সবার ঝগড়া।

—আমি ছোট লোক, ঝগড়াটে, তাতে তোমার কি ? তোমার খাই না পরি ? যাও তোমার সঙ্গেও আড়ি।

—এই লক্ষ্মীটি, অবুঝের মতো রাগ করছ কেন ? তুমি আড়ি দিলেও আমি কিছুতেই আড়ি দেবো না। আমার সঙ্গে ভাব না দিলে কিছুতেই তোমায় এখান থেকে যেতে দেবো না। ভাব করলে তো লক্ষ্মীটি ?

—বেশ, ভাব করলাম। তবে প্রতিজ্ঞা কর যে সুশোভনা বা লীলা বা সীতা বা ঘনা এদের কারো কাছ থেকে কিচ্ছু নেবে না। আমার সঙ্গে ছাড়া ওদের কারো সঙ্গে খেলবেনা।

—বেশ, প্রতিজ্ঞা করছি।

—উঁ-হুঁ। ও রকম মুখে বললে হবে না, আমার গা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর।

যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার নির্দেশমতো তিন সত্যি করল। অঙ্গে সে তার রাখল অঙ্গীকার।

—কিন্তু—যুবনাশ্ব আমতা আমতা করল।

—কিন্তু কি ? সুরঞ্জনার ভ্রূচিন্তাকুঞ্চিত হল।

—তোমাকেও প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—কি প্রতিজ্ঞা ? বিস্মিত হল সুরঞ্জনা।

—প্রতিজ্ঞা কর যে রোজ অন্ততঃ পক্ষে একবার করে আমার সঙ্গে দেখা করবে ? দুর্জয় দুঃসাহসে ভর করে বলে ফেলল যুবনাশ্ব।

—রোজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে হবে কেন ? সুরঞ্জনার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হচ্ছিল।

—আমি তোমায় রোজ একবার করে দেখব।

—ধ্যেৎ, দুষ্টু কোথাকার! যুবনাশ্ব আজ প্রথম দেখল যে সুরঞ্জনার মতো দজ্জাল মেয়েও লজ্জা পায়।

—ধ্যেৎ বললে চলবেনা, আমাকে ছুঁয়ে তিনসত্যি করতে হবে। যুবনাশ্বের কণ্ঠে দুরন্ত দুঃসাহস।

সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের হাতে খিম্‌চি কেটে দিয়ে বলল, আচ্ছা বাবা তাই হবে! আমারই তো মজা। হোমটাস্কের অংকগুলো রোজ রোজ তোমায় দিয়ে করিয়ে নেবো।

—কি দুষ্টু মেয়ে তুমি রঞ্জনা।

যুবনাশ্বের কথায় কান না দিয়ে হঠাৎ সুরঞ্জনা বলে উঠল, এই, চল যাই, বনের ভিতর একটা নারকেল কুলের গাছ আছে—ইয়া বড় বড় কুল।

—না ভাই, তুমি যাও, আমি যাবো না—মা জানতে পারলে মেরে পিঠের হাড় গুঁড়ো করে দেবে। আর তাছাড়া আমি গাছে উঠতে জানি না! সুরঞ্জনা ভেংচি কেটে বলল, হ্যাঁদা গোবিন্দ! যাই বাবা, আমি একাই মজা করে খাবো! দৌড়ে সুরঞ্জনা বাঁশ বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

## (দুই)

রোজ একবার করে দেখা দেবার আশ্বাসে সত্যবন্দী হলেও সত্য-সত্যই সুরঞ্জনা রোজ দেখা দেয় না। পরপর বেশ কয়েকদিন সুরঞ্জনার দেখা না পেয়ে যুবনাশ্ব উতলা হয়ে উঠল। মোড়লদের বাগানে যেখানে সুরঞ্জনার সঙ্গে যুবনাশ্বের সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল সেখানে একদিনও তাকে দেখা গেল না। সুরঞ্জনা, সুশোভনা প্রভৃতি পাড়ার সব মেয়েই বিনোদিনী স্কুলে পড়ে। নিজেদের ভিতর যতই বিবাদ বিসংবাদ থাকনা কেন, পাড়ার সব মেয়েরাই

এক সঙ্গে স্কুলে যায়। দল বেঁধে স্কুলে যাওয়া মেয়েদের মধ্যে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাকে দেখতে পেলো না। সুরঞ্জনার অসুখবিসুখ কিছু করেনি তো? যুবনাশ্বের হৃদ্‌পিণ্ড ধ্বক্ করে উঠল। মনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে অবশেষে ইতঃস্ততঃমন্থর পায়ে সে সুরঞ্জনাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হল। শিকল নাড়ার শব্দ পেয়ে সুরঞ্জনার মা এসে দরজা খুলে দিলেন। যুবনাশ্বকে দেখে বললেন, তুমি শান্তির ছেলে না? এসো বাবা।

যুবনাশ্ব বাড়ীর উঠানে এসে দাঁড়াল। চারিদিক বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে তাকিয়েও সুরঞ্জনার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। সুরঞ্জনার মা বলে চললেন, সুরো তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সুরো বলে তুমি বছরবছর সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হও বলে কতো প্রাইজ পেয়েছ।

আত্মপ্রসংসায় যুবনাশ্ব লজ্জিত হল। থাকতে না পেরে কিন্তু কিন্তু করে অবশেষে সে বলেই ফেলল, সুরঞ্জনাকে তো দেখছি না মাসীমা?

—ওর কথা আর বলনা বাবা। আজ তিনদিন হল মেয়েটি জ্বরে বেহুঁশ। কথা বললে কিছুতেই শুনবে না। আজ এ পুকুর, কাল সে পুকুর, পরদিন গঙ্গা এই করে বেড়াচ্ছে—ওই গাছচালানী মেয়েকে নিয়েই আমার মরণ হয়েছে। বাপ মরা ছেলে মেয়ে সব—বকতেও পারি না!

—সুরঞ্জনা কেথায় আছে মাসীমা?

—ওই ছোট ঘরে। মাসীমা নাক বরাবর অঙ্গুলি দিয়ে ঘরটি দেখিয়ে দিলেন।

—আমি একটু সুরঞ্জনাকে দেখে আসব মাসীমা?

—যাও না বাবা—যাও—

বন্ধ দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার ঘরে ঢুকল। বিছানার একপাশে চাদরমুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে ছিল

সুরঞ্জনা। যুবনাশ্ব বিছানার পাশে গিয়ে ঋজুহাতে সুরঞ্জনার মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে ডাকল, রঞ্জনা—

সুরঞ্জনা চোখ মেলে পাশে যুবনাশ্বকে দেখে কম আশ্চর্য্য হল না। ধূসর-পাণ্ডুর মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। কাজল চোখে ঘনিয়ে এল সজল ব্যাকুলতা।

—তোমার বুঝি জ্বর হয়েছে রঞ্জনা? সমবেদনায় আর্দ্র যুবনাশ্বের কণ্ঠস্বর।

সুরঞ্জনা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

—দেখি তোমার জ্বর আছে কিনা। যুবনাশ্ব তার হাতের উল্টোপিঠ সুরঞ্জনার কপালে রেখে উত্তাপ অনুভব করে বলল, তোমার গা এখনো বেশ গরম, জ্বর আছে। এবার থেকে তুমি আর জলে সাঁতার কাটিতে পারবে না, তাহলে আমার কাছ থেকে শাস্তি পেতে হবে।

—ইস্! শাসন করা হচ্ছে! রোগশীর্ণ সুরঞ্জনার বিশুষ্কমুখে স্নিগ্ধহাসির জ্যোতি বিচ্ছুরিত হল। একটা অনির্বচনীয় পুলক শিহরণ বহে গেল তার সারা দেহে।

—তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো রঞ্জনা, আমার ভালোলাগছে না!

—আচ্ছা তাই হবে। বেশী বেশী করে ওষুধ খাবো, তা'হলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠব।

—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো রঞ্জনা?

—ধ্যেৎ, ওসব কিছু করতে হবে না,—আমার লজ্জা করবে। সুরঞ্জনা সস্নেহে যুবনাশ্বের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি কি করে জানলে আমার জ্বর হয়েছে?

—তোমাকে পরপর তিনদিন দেখতে না পেয়ে এই রকম একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম।

—আমার এক এক সময় ভারী ভয় হয় যুবনাশ্ব, যদি মরে যাই? আমার কিন্তু মরতে একটুও ইচ্ছা করে না।

—দূর, যত সব বাজে চিন্তা,—মরতে যাবে কি দুঃখে ?

—যুবনাশ্ব তুমি শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়েছ ?

—হ্যাঁ, কেন রঞ্জনা ? যুবনাশ্ব বুঝতে পারল না কোন্ প্রসঙ্গের ভূমিকা আরম্ভ হল।

—আমিও মায়ের সঙ্গে দেবদাস সিনেমায় দেখেছি। এক এক সময় মনে হয় তুমি দেবদাস আর আমি—ধ্যেৎ, কি যে সে বাজে হ-য-ব-র-ল ভাবি তার ঠিক নেই। আমি তোমার কেউ নই, তাই না ?

যুবনাশ্ব চম্‌কে উঠল। সুরঞ্জনার মুখে এ প্রশ্ন শোনবার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। জ্বরেব ঘোরে সুরঞ্জনা ডিলিরিয়াম বকছে না তো ? বেশ কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো থেকে যুবনাশ্ব বলল, আজ চলি, কাল আবার আসব কেমন রঞ্জনা ?

—আসবে তো ঠিক ? না এলে তোমার সঙ্গে সত্যি সত্যি আড়ি দিয়ে দেবো কিন্তু। আব্‌দারের মতো করে সুরঞ্জনা বলল।

যুবনাশ্ব ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তোমার তাগাদার চেয়ে আমার আসার তাগিদ বুঝি কম ?

যুবনাশ্ব উঠে পড়ল। বাড়ী ফেরবার পথে একবার বুড়োশিবের মন্দিরে গেল।

পরের দিন অবশ্য যুবনাশ্বকে সুরঞ্জনাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে হল না। মণ্ডলদের বাগানের পাশ দিয়ে যেতেই সুরঞ্জনার চিৎকার শোনা গেল।

—যুবনাশ্ব—

যুবনাশ্ব শব্দ লক্ষ্য করে মুখ তুলে তাকাতেই দেখল সুরঞ্জনা কুলগাছ থেকে দ্রুতগতিতে নেমে তার কাছে আসছে। যুবনাশ্ব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কাল যাকে জ্বরে শয্যাশায়ী দেখে এসেছে আজ সে সহজভাবে গাছে উঠে কুল পাড়ছে ! যুবনাশ্ব কিছু বলবার আগেই সুরঞ্জনা কাছে এসে বলল, এই নাও, কুল খাও।

—ওই কাঁচা টক কুল আমি খাই না।

—বেশ তো বাবা ভালই হল, আমি একাই সব খাবো।

—রঞ্জনা, তুমি কাল পর্য্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারনি আর আজকে গাছে উঠে কুল পাড়ছ। আশ্চর্য্য তো?

—কাল তুমি চলে যাবার পরই আমার জ্বর ছেড়ে গেছে—মাইরি বলছি! রাণু ঘুমুচ্ছে আর মা পুকুরে বাসন মাজতে গেছে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

—হুঁ! সে তো বুঝতেই পেরেছি। এখানকার বুড়োশিব খুব জাগ্রত দেবতা, তাই না রঞ্জনা?

সুরঞ্জনা মোড়ঘোরা প্রশ্নের দিক্ দর্শন করতে না পেরে বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তাতে তোমার কি?

—ওখানে মানত করে লোকে যা কামনা করে তাই পায়, না রঞ্জনা?

—লোকে তো তাই বলে। কিন্তু তাতেই বা তোমার কি?

—বারে! কাল যে তোমাদের বাড়ী থেকে ফেরবার পথে ওই বুড়োশিবের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলেছিলাম, হে ঠাকুর, তুমি রঞ্জনার জ্বর সারিয়ে দাও, আমি তোমায় পাঁচ পয়সা পূজো দেবো। জানো রঞ্জনা, ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তাই তো তোমার জ্বর সেরে গেল।

সুরঞ্জনার স্বপ্ন মাখানো কালো কালো হরিণ চোখে ফুটে উঠল আলোক-পুলক নবজাতকের আদিম বিস্ময়। সে দৃষ্টিতে ব্যাকুল কোমল কমনীয়তার সুধানিস্যন্দিনী অনন্ত বিস্তার উদ্বেলতা বাঙ্ময় হল। ভাবপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিয়োগবিচ্ছিন্ন করে নিতে অবশ্য সুরঞ্জনার দেরী হল না।

—আমার জ্বর হয়েছে, দরকার হলে আমার মা মানত করবে, তুমি করতে যাবে কেন?

যুবনাশ্ব বলতে যাচ্ছিল, আমি যে তোমায় ভালবাসি কিন্তু

সরাসরি সেটা জিভে আটকে গেলে। শুধু বলল, বারে আমিই তো করব! তোমার জ্বর ভালো না হলে কার সঙ্গে গল্প করব?

—যাওনা বড়লোকের আদুরে মেয়ে সুশোভনা রয়েছে, লীলা রয়েছে, কমল রয়েছে—ওদের সঙ্গে গল্প করগে যাওনা।

—উ-হুঁ। ওদের কাউকে তোমার মতো ভাল লাগে না।

—আমার কাছে মধু আছে বুঝি? খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল সুরঞ্জনা।

—আমার সঙ্গে গল্প করতে তোমার ভালো লাগে না রঞ্জনা?

সুরঞ্জনা ভেংচি কেটে বলল, ইস্, আমার ভালো লাগতে বয়ে গেছে। কুল না খাও, এই নাও তোমার জন্যে পেয়ারা এনেছি। গাছটায় বারো মাস পেয়ারা হয়।

—এখন আমি পেয়ারাও খাবনা রঞ্জনা।

—না খাবে, না খাবে যাও, আমার ভারী বয়ে গেছে সাধতে! খেয়ো না—খেতে হবে না—যাও এখান থেকে।

—আজ চলি রঞ্জনা, আবার কাল বিকেলে এখানে আসব।

—আমি আসব না—আর কোনো দিনও আসব না—

মিনতি করল যুবনাশ্ব, রাগ করছ কেন রঞ্জনা?

—সুশোভনা কুল দিলে দুহাত বাড়িয়ে নাও—পেয়ারা দিলে চার হাত বার করে নিতে—খুব মিষ্টি লাগত—আমি সব বুঝি—

সুরঞ্জনার অভিমানের উৎস কোথায় বুঝতে পেরে যুবনাশ্ব হেসে ফেলল: আচ্ছা বাবা, দাও পেয়ারা খাই!

হাসি ফুটে উঠল সুরঞ্জনার মুখে। যুবনাশ্বের হাতে পেয়ারা গুঁজে দিয়ে ছোট্ট একটি ভেংচি কেটে বলল, ঢং হচ্ছিল বাবুর!

—কাল বিকালে এখানে আসবে তো রঞ্জনা?

—বাবা বাবা! কতবার বলব? আসব, আসব, আসব—এই তোমার গাছুঁয়ে তিনসত্যি করলাম।

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যায় শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে

যুবনাশ্ব দেখল সুরঞ্জনা ভক্তিভরে হাত জোড় করে ঠাকুর প্রণাম করছে।

—রঞ্জনা, তুমি এখানে কি করছ?

চমকে উঠে সুরঞ্জনা ফিরে দেখল যুবনাশ্ব।

—তাই বল তুমি! আমার যা ভয় লেগেছিল। আশ্বস্ত হল সুরঞ্জনা।

—তুমি এখানে একা একা কি করছ রঞ্জনা?

—ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি।

—তুমি কি প্রার্থনা করছিলে বলবে না আমায় রঞ্জনা?

—উঁ-হু, কাউকে বলব না, আমার লজ্জা করবে।

—আমি জানি তুমি কি চাইছিলে।

—ইস্, ছাই জানো। বলতো আমি কি চাইছিলাম? কৌতূহলী হল সুরঞ্জনা।

—শিবের কাছে সব কুমারী মেয়ে যা চায় তুমিও তাই চাইছিলে —শিবের মতো বর প্রার্থনা করছিলে। সবজান্তার মতো সগর্বে বলল যুবনাশ্ব।

—শিবের মতো ভুঁড়িওয়ালা, ছাইমাখা, যার এক কাণাকড়িও ট্যাকে সম্বল নেই অমন বর চাইতে আমার বয়ে গেছে আমি তোমার মতো বর চাইছিলুম।

বিস্ময়ের আত্যন্তিকতায় এবং সুরঞ্জনার সত্য বলার সংকোচ-হীনতায় যুবনাশ্ব স্তব্ধ হয়ে গেল।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ সুরঞ্জনা বলল, আমি সব জানি।

—কি জানো? যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার অসংলগ্ন কথা বুঝতে পারল না।

প্রত্যয়ভরা অচঞ্চল কণ্ঠে সুরঞ্জনা বলল, তুমি আমায় ভালবাস।

—আর তুমি বুঝি বাসো না?

উত্তর না দিয়ে সুরঞ্জনা বলল, আমার বাড়ী এসে গেছে, চললাম।

## তিন

দুটি অরুণপ্রাতের কিশোর প্রাণের মিলিত উচ্ছ্বাস-উদ্বেলভরা অগ্রগতির ভিতর একটী বছর হারিয়ে গেল। জীবননদীর এপারে মায়াভরা কৈশোর, ওপারে বিরহ-বিচিত্র রস-ঋদ্ধ যৌবন। মাঝখানে নীল যমুনায় একটী ঢেউ ভেঙ্গে পড়ল।

বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল বার হলে দেখা গেল যে সকলকে অবাক করে দিয়ে সুরঞ্জনা প্রথম দশজনের একজন হয়ে ক্লাসে উঠেছে। কিন্তু অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার দেখা গেল যুবনাশ্বের বেলায়। প্রত্যেক পরীক্ষায় সে এতোদিন একচ্ছত্রভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে কিন্তু টেস্ট পরীক্ষায় দেখা গেল তার স্থানচ্যুতি ঘটেছে। নামটা তলিয়ে গেছে বেশ কিছু নীচে। ছেলের পড়াশুনোর শুভাশুভায় মায়ের উৎকণ্ঠা অসাধারণ।

সেদিন বিকাল বেলায় যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাদের বাড়ী যাবার জন্য বার হচ্ছিল।

—যুবনাশ্ব দাঁড়াও। গম্ভীর গলায় মা ডাকলেন। মা তাকে কখনো নাম ধরে ডাকেন না এবং সাধারণতঃ 'তুমি' সম্বোধন করেন না। আসন্ন দুর্যোগের ঘনায়মান সংকেতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যুবনাশ্ব!

—আমায় কিছু বলবে মা? ভয়ে ভয়ে যুবনাশ্ব বলল।

—হ্যাঁ, এদিকে এসো—কোথায় যাচ্ছ?

যুবনাশ্ব সংকোচে মাথা নীচু করল।

—উত্তর দাও, কোথায় যাচ্ছ তুমি? মায়ের গলায় শাসনের দৃঢ়তা।

—সুরঞ্জনা একটা অংক করে দিতে বলেছিল—তাই—তাই—

ওজর দেখিয়ে নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা কোরোনা।

—সুরঞ্জনা ভালো মেয়ে মা—আম্‌তা আম্‌তা করে বলেই ফেলল যুবনাশ্ব।

—ও বয়সে সব মেয়েকেই ভাল লাগে বাবা!

তুমি আমায় বিশ্বাস কর না মা? যুবনাশ্ব মিনতি-কাতর।

মা সরে এসে বললেন, বাজী জিতব এই বিশ্বাস নিয়ে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি তার সর্বস্ব পণ রেখে জুয়া খেলে? পরীক্ষায় তুমি কতো খারাপ রেজাল্ট করেছ আশাকরি এরই মধ্যে সেটা ভুলে যাও নি।

যুবনাশ্ব লজ্জা আর অপমানে মাথা হেঁট করল।

—আর কেন যে পরীক্ষার ফল খারাপ হয়েছে সে কারণ আমার চেয়ে তুমিই ভালো জানো। ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে পর্য্যন্ত সুরোর সঙ্গে তোমার মেলামেশা বন্ধ রাখতে হবে। তুমি ভুলে যাও কেন তোমার কেউ নেই, কিছু নেই, মাথা গোঁজবার তো স্থান নেই—তোমায় মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। যাও, পড়গে যাও।

মায়ের কঠিন কঠোর মুখের এ আদেশ অমান্য করবার মতো দুঃসাহস যুবনাশ্বের নেই। মুখ নীচু করে সে পড়ার ঘরে চলে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত সুরঞ্জনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে না।

কিন্তু বই খুলে বসলেই উদ্ভিন্নযৌবনা সুরঞ্জনার মুখখানা স্মৃতির সুরভি নিয়ে ভেসে ওঠে। সব কিছুকে শাসন করা চলে কিন্তু মৃগমনকে করায়ত্ত করবে কেমন করে?

দীঘির ঘাটে স্নান করতে গিয়ে কয়েকদিন পরে সুরঞ্জনার সঙ্গে যুবনাশ্বের সাক্ষাৎ হল।

—তিনদিন ধরে তোমার জন্যে কত অপেক্ষা করলাম—বাবুর আর আসাই হলনা! যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না। সুরঞ্জনার স্বভাবসিদ্ধ অভিমান উদ্বেল কণ্ঠস্বর।

যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার মান ভাঙ্গাবার জন্য মিনতি করল: এই রঞ্জনা রাগ করো না, শোনো সব কথা আগে। পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হয়েছে বলে মা আমায় ভারী বকেছে—

চিলের মতো ছোঁ মেরে সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আর আমার সঙ্গে দেখা করতে মানা করেছে তো? বেশ করেছে! পরীক্ষা খারাপ করেছ কেন?

যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ নীচু করে বলল, তোমার সঙ্গে ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে আর দেখা হবে না রঞ্জনা।

—বেশ তো, কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে দেখা করতে বলছে শুনি? তোমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বয়ে গেছে।

তুমি আমায় একটুও ভালবাসোনা রঞ্জনা?

—বাসি না-ই তো।

—ফাইন্যাল পরীক্ষার এখনো তিনমাস দেরী—এর মধ্যে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না রঞ্জনা!

—ইস্, আমার সঙ্গে দেখা না করে তুমি যেন থাকতে পারবে!

উপায়ও নয়, সিদ্ধান্তে এসে গেছে সুরঞ্জনা। সহসা গলার স্বরকে নীচুগ্রামে এনে সুরঞ্জনা বলল, শোনো স্কুলের কোচিং ক্লাশ করে ফেরবার পথে আমাদের বাড়ী যাবে—আমারও সঙ্গেও দেখা হবে আর আমার অংকগুলোও করা হয়ে যাবে। কেউ কিছু জানতে পারবে না, কেমন?

আনন্দ উজ্জ্বল মুখে যুবনাশ্ব বলল, তাই হবে রঞ্জনা।

—কিন্তু তার আগে একটা শপথ করতে হবে। সুরঞ্জনার চোখে মুখে দুষ্টু হাসির বিচ্ছুরণ হল।

—কি শপথ? বোকা বোকা মুখে জিজ্ঞাসা করল যুবনাশ্ব।

—শপথ করতে হবে যে তোমায় ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেতে হবে।

উৎসাহে যুবনাশ্বের দু'চোখ জ্বলে উঠল।

—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব রঞ্জনা।

সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের কাছে সরে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আর বল যে আমার কথা বেশী চিন্তা করবে না, ওতে শরীর খারাপ হয়, পড়াশুনোয় মন বসে না।

—এ প্রতিজ্ঞা আ্যাম কিছুতেই করতে পারবনা রঞ্জনা।

যুবনাশ্বের পিঠে ছোট্ট একটি কিল মেরে আত্মতৃপ্ত সুরঞ্জনা বলল, 'দুষ্টু ছেলে কোথাকার!'

ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল বার হলে দেখা গেল, যুবনাশ্ব নবম স্থান অধিকার করেছে। স্কুলের টেস্ট পরীক্ষায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল তারা কেউই জুনিয়ার স্কলারশিপও পায়নি।

এ সংবাদ সারা সহরে ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেয়ে যুবনাশ্ব ছুটে এলো মায়ের কাছে।

—মা—মা—

মা তুলসী তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালছিলেন। সরে এসে বললেন, কি হয়েছে রে খোকা? কি বলবি?

—আমি পাশ করেছি মা। যুবনাশ্ব মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকালো।

—পাশ তো তুই করবি খোকা। মায়ের স্নিগ্ধকণ্ঠে স্নেহ ঝরে পড়ল।

—এমনি পাশ নয়, নাইন্‌থ হয়েছি—স্কলারশিপ পাবো—কলেজে মাইনে লাগবে না!

মায়ের চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যুবনাশ্বের মাথায় সস্নেহে এবং সযত্নে হাত বুলিয়ে দিলে বললেন, বুঝিছি, সুরোকে খবরটা দেবার জন্যে তোর মন ছটফট করছে। আচ্ছা আগে বুড়োদাদুকে খবরটা দিয়ে আয়—তারপর সুরোর কাছে যাস।

মা যে কি করে এসব জটিল ব্যাপার বুঝতে পারে ভেবে যুবনাশ্ব অবাক হয়ে যায়। দাদু অথর্ব, উঠতে পারেন না। শয্যাশায়ী দাদুকে সুখবরটা দিয়ে যুবনাশ্ব ভেবেছিল সুরঞ্জনার কাছে ছুট দেবে। তার সাফল্যের সংবাদ সুরঞ্জনাকে না জানানো পর্য্যন্ত যুবনাশ্ব সত্যই স্থির হতে পাচ্ছিলনা। দাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে যুবনাশ্ব আশ্চর্য্য হয়ে দেখল সুরঞ্জনা রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। যুবনাশ্ব কাণ পেতে শুনল তাকেই কেন্দ্র করে কথাবার্ত্তা চলছে।

—যুবনাশ্বদার মতো ছেলে সারা পাড়ায় আর একটিও পাবেনা শান্তি মাসী। একি আমাদের পাড়ার কম গর্বের কথা? যুবনাশ্ব-দার স্কুলের মাষ্টার মশাইরা সবাই মিলে ঠিক করেছে যুবনাশ্বদাকে গোল্ড মেডেল দেবে।

যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার পিছনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে চুপ করে ওদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। দুবার গলা ঝাড়া দিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে বলল, এত সব খবর এরই মধ্যে তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করলে সুরঞ্জনা?

সুরঞ্জনা শান্তিমাসীর অলক্ষ্যে যুবনাশ্বকে ভেংচি কেটে বলল, যেখান থেকেই শুনিনা কেন, অতো খোঁজে তোমার কি দরকার? আর হ্যাঁ, শান্তিমাসী, আমাদের খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু।

মা হেসে ভালবেসে বললেন, তোদের খাওয়াবার মতো সৌভাগ্য কি আমি করেছি মা? যুবনাশ্ব লেখাপড়া শিখে চাকরীবাকরী করুক, তখন নিশ্চয়ই তোদের সব খাইয়ে দেব।

ততদিন সুরঞ্জনাই বুঝি এখানে থাকবে—ও তখন শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে না? যুবনাশ্ব টিপ্পনী কাটল।

—যা খালি অসভ্য কথা! আমার শ্বশুরবাড়ী যেতে বয়ে গেছে। শান্তিমাসী চললাম। লজ্জা পেয়ে সুরঞ্জনা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—আবার আসিস সুরো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে খোকা, সুরোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।

চকিত চঞ্চল চরণে প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাকে ধরে ফেলল।

—এই রঞ্জনা দাঁড়াও—অতো জোরে চলে না।

যুবনাশ্বকে পিছনে দেখে সুরঞ্জনা মৃদু হেসে চলার গতি হ্রাস করে দিল।

—যুবনাশ্ব আবার কবে থেকে যুবনাশ্বদা হল শুনি?

—যবে থেকে রঞ্জনা সুরঞ্জনা হয়েছে।

—মায়ের সামনে বুঝি তোমায় ওই কাব্যমাখানো মধুর নাম ধরে ডাকা যায়? আচ্ছা রঞ্জনা, আমার পরীক্ষার খবর শুনে তোমার আনন্দ হয় নি।

ইস্, তোমার পরীক্ষা পাস না আরো কিছু—পরীক্ষা তুমি পাস করনি, আমি করেছি। আমি পিছন থেকে প্রেরণা না যোগালে তুমি তো ফেল করতে।

যুবনাশ্ব হেসে বলল, তোমার কথার একবর্ণও মিথ্যা নয় রঞ্জনা। তোমার কাছে শপথ করেছিলাম স্কলারশিপ নেবো—সে প্রতিজ্ঞা আমি পালন করেছি।

সহসা সুরঞ্জনা দাঁড়িয়ে পড়ে যুবনাশ্বের পায়ের কাছে নত হয়ে বলল, দাঁড়াও যুবনাশ্ব এমন দিনেই তোমায় প্রণাম করতে হয়। তোমার সাফল্যে তোমার রঞ্জনার চেয়ে বেশী আনন্দ আর কার হবে বল?

যুবনাশ্ব সস্নেহে সুরঞ্জনাকে মাটি থেকে দুহাত দিয়ে বুকে তুলে নিয়ে বলল, সে কি আমি জানি না রঞ্জনা? তোমার বাড়ী এসে গেছে, এবার আমি যাই?

—ইস্, মায়ের সঙ্গে দেখা করে চা নাখেয়ে গেলে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবোনা?

সুরঞ্জনার মা যুবনাশ্বের সাফল্যের সংবাদ শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। চা খেতে খেতে সুরঞ্জনা এবং যুবনাশ্ব পরদিন ভেলায় চড়ে ডাকাতকালীর মন্দিরে যাবার প্ল্যান করল। পরদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী সুরঞ্জনা ঠিক সময় এলো। একটা বাসন্তীরং-এর সাড়ী সুরঞ্জনা পরিপাটি করে পরেছে। উদ্ভিন্ন যৌবনের উচ্ছল প্রাণ বন্যায় অপরূপ হয়েছে সুরঞ্জনা। যুবনাশ্ব অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে।

—কি দেখছ অমন করে ?

—তোমায় দেখছি, তুমি ভারী সুন্দর দেখতে হয়েছ রঞ্জনা।

—ধ্যেৎ, দুষ্টু কোথাকার। আমার কাছে আমার কথা বললে লজ্জা করে।

দুজনে দীঘির কাছে এসে দাঁড়াল। যুবনাশ্ব কাপড়টা আঁটসাঁট করে কোমরে বেঁধে নিল। কলাগাছের ভেলাটা খুব কাছে টেনে এনে বলল, আস্তে আস্তে আমার পিছু পিছু ওঠো—তা নাহলে দুজনেই জলে পড়ে যাবো কিন্তু।

যুবনাশ্ব আস্তে আস্তে ওঠা সত্ত্বেও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। সুরঞ্জনা তাড়াতাড়ি ধনে না ফেললে যুবনাশ্ব জলে পড়ে যেতো।

—উঃ, তুমি যে এমন হ্যাদারাম জানতাম না। হাত ছাড়ো।

লজ্জা পেয়ে যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি সুরঞ্জনার হাত ছেড়ে দিল। বারকয়েক টালবেটাল হলেও ভেলা নিরাপদে দীঘির অপর পারে এসে ভিড়ল। সুরঞ্জনা লাফ দিয়ে পাড়ে নেমে পড়ল। যুবনাশ্ব নামতে গিয়ে জলে পড়ে গেল। কাপড়ের তলার দিকটা সব ভিজে গেল।

—নাঃ, তুমি একেবারে কোনো কাজের নও। আমার হাত ধর। সুরঞ্জনা হাত বাড়িয়ে যুবনাশ্বকে ডাঙ্গায় তুলে নিল।

সাবধানে কাঁটা বাঁচিয়ে পথ চলতে চলতে সহসা যুবনাশ্ব দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আচ্ছা রঞ্জনা, এখন যদি বন থেকে ষণ্ডাগুণ্ডা জোয়ানমদ্দ দুটো লোক বেরিয়ে এসে তোমাকে—মানে আমাদের—আক্রমণ করে ?

—ইস্, আমি বুঝি ভয় করি? এ আর তোমার কোলকাতার ফুলটুসি মেয়ে পাওনি—এই দেখো—

সুরঞ্জনা তার কোমরের কাপড়ের ভিতর থেকে একটি দীর্ঘ ছুরিকা বার করে বলল, এইটা কাছে থাকতে আমায় আর ছুঁতে হচ্ছে না।

ঝক্‌ঝকে ছুরিকা দেখে যুবনাশ্ব বেশ বিস্মিত হল। সুরঞ্জনার উপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ফস্ করে যুবনাশ্ব বলে ফেলল, আমার কাছ থেকে তুমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা আশা করনা রঞ্জনা?

—তুমি—তুমি কি বিশ্বাসঘাতকতা করবে? সুরঞ্জনা বুঝতে পারল না।

—গুণ্ডারা যা করে—মানে তোমায় বনের মধ্যে একা পেয়ে যদি এখন অপমান করি?

—তুমি করবে অপমান? তুমি আবার একটা মানুষ! হেসে সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ে আর কি!

প্রশ্রয় পেয়ে দুঃসাহসী যুবনাশ্ব সহসা সুরঞ্জনার একটা হাত ধরে তাকে খুব কাছে টেনে বলল, রঞ্জনা, একটা চুমো দাও লক্ষ্মীটি!

সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের মুখের উপর আঙ্গুল দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না, না ও সব করেনা, কি হয়ে যাবে—আমার ভয় করে।

—বোকামেয়ে, শুধু চুমু খেলে ভয়ের কিচ্ছু হয় না—সত্যি বলছি!

—না না, এখন ওসব না—হাত ছাড়ো—পরে—

যুবনাশ্ব আর পীড়াপীড়ি করল না। সে সুরঞ্জনার হাত ছেড়ে দিল।

—আচ্ছা রঞ্জনা, আমি না হয়ে যদি অন্য কেউ তোমায় এমন ভাবে হাত ধরত, তাহলে তুমি কি করতে?

সুরঞ্জনা ছুরিটি দেখিয়ে বলল, এটির সদ্ব্যবহার করতাম।

—তুমি আমায় ভালবাসো, তাই না রঞ্জনা?

যুবনাশ্বের হাতে চিমটি কেটে স্বরঞ্জনা বলল," আহা, কিচ্ছু যেন বোঝ না! তুমি আমায় কতো ভালবাসো তাই বল।

—যদি বলি, একটুও বাসি না?

—ইস্, বললেই আমি বিশ্বাস করছি আর কি?

—সত্যই রঞ্জনা তোমায় আমি বড় ভালবাসি। এটা শিভাল্‌রির যুগ হলে কবির ভাষায় বলতাম "forty thousand brothers could not with all their quantity of love make up my sum." জানো রঞ্জনা, শুধু তোমারই কথা আমি নির্জনে ভাবি, তোমারি মুখ স্বপ্নে দেখি। মনের ক্যামেরা দিয়ে তোমার কতো ছবি যে তুলেছি সে শুধু আমিই জানি।

স্বরঞ্জনা আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল: আমাকে খুব দজ্জাল মেয়ে বলে মনে হয় যুবনাশ্ব?

—তোমার মতো প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরা তাজা মেয়েরই আজ দেশের বড় প্রয়োজন, রঞ্জনা। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় এমন ললিত লবঙ্গ-লতা ড্রয়িংরুম গার্ল দিয়ে দেশের কি কাজ হবে বল?

—হুঁ, আমার মতো শক্ত সামর্থ্য জোরালো ষ্টীম ইঞ্জিন না হলে তোমার মতো গোবেচারী গাধাবোটকে টানবে কেমন করে? খিল-খিল করে হেসে উঠল স্বরঞ্জনা: আজ তোমায় এখানে কেন এনেছি জানো যুবনাশ্ব? এই কালী খুব জাগ্রত দেবতা। আগে ডাকাতেরা প্রতি অমাবস্যার রাত্রে এখানে নরবলি দিত—সেই সব আর্ত্ত মানুষের কান্না আকাশে বাতাসে আজও ভেসে বেড়ায়—বনমর্মরে তাদের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। রক্তচক্ষু এক বামাচারী তান্ত্রিক এখানে বসে শবসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে। ওসব কথা থাক। আজ আমরা মায়ের চরণে হাত মিলিয়ে প্রার্থনা করব যেন জীবনেমরণে কোনোদিন আমাদের বিচ্ছেদ না হয়। এই সেই মন্দির—আমরা এসে গেছি। আমার পিছু পিছু এসো। স্বরঞ্জনার নির্দেশ মতো যুবনাশ্ব মন্দিরে এসে ঢুকল। দুজনে ভক্তিভরে ভাঙ্গা-

দেউলের জীর্ণ দেবতার কাছে তাদের মনস্কামনা জানিয়ে অঞ্জলি দিল। মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নামতেই দুজনে চমকে উঠে দেখল এক বিরাট চন্দ্রবোড়া সাপ শ্লথমন্থর গতিতে মন্দিরের ফাটলের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। যুবনাশ্ব ভয় পেয়ে সুরঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সরে এসো রঞ্জনা, সাপ।

সাপ শয়তান! অমঙ্গলের প্রতীক। মঙ্গলময় দেবতা কি আমাদের প্রার্থনা শুনলেন না? অজানা আশঙ্কায় সুরঞ্জনা কেঁপে উঠল।

ঘাটে এসে দুজনেই বেকুব বনে গেল। দেখল ভেলা ভেসে দীঘির মাঝখানে চলে গেছে। যাবার সময় সেটাকে কিনারায় বেঁধে রেখে যাবার কথা কারো মনে ছিল না।

—ভেলা যে ভেসে গেছে, কি হবে রঞ্জনা? যুবনাশ্ব ভয়ে ভয়ে সুরঞ্জনাকে শুধালো।

—চল, প্রতাপ শৈবলিনির মতো সাঁতার কাটি দুজনে।

যুবনাশ্ব সামান্য সাঁতার শিখেছে কিন্তু এতবড় দীর্ঘ দীঘি সাঁতার দিয়ে পার হবার কথা ভাবতেই সে শিউরে উঠল।

—না না রঞ্জনা, আমি ভালো সাঁতার জানি না—হয়ত মাঝখানে ডুবে যাবো। তাছাড়া অনেক সাপখোপ সব জলের উপর চলে বেড়ায়।

—ভীতু কোথাকার! এইখানে দাঁড়াও, আমি সাঁতার দিয়ে ভেলাটা নিয়ে আসছি। কথা শেষ করেই সুরঞ্জনা সাড়ীর আঁচল আঁটসাঁট করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যুবনাশ্ব ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করে বারবার বলতে লাগল, হে ঈশ্বর, আমার রঞ্জনার যেন কিছু না হয়।

সুরঞ্জনার সত্যই কিছু হল না। সে সহজ, স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল

গতিতে সাঁতার দিয়ে ভেলাটি কিনারায় নিয়ে এলো। দুজনে পাশা-পাশি ঘেঁসাঘেঁসি ভেলায় বসে দীঘি পার হল।

—খুব মজা করা গেল তাই না যুবনাশ্ব?

—মজা না হাতি! আমার যা ভয় হয়েছিল রঞ্জনা—আর কোনোদিন ওখানে যাচ্ছি না। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও রঞ্জনা, তোমার জামাকাপড় সব ভিজে গায়ে লেপ্‌টে গেছে।

অপাঙ্গে কটাক্ষ হেনে সুরঞ্জনা চলে গেল। চলা নয়, ছন্দোবদ্ধ নৃত্য।

( চার )

যুবনাশ্বের অদম্য ইচ্ছা বড় হয়ে সে বিরাট ডাক্তার হবে। দেশের মানুষের ব্যাধি সারাবে, তাদের আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু বাড়িয়ে তুলবে। যুবনাশ্ব একদিনও ভোলেনি যে তার বাবা পয়সার অভাবে প্রায় বিনা চিকিৎসায় রাজরোগে মারা গেছে। আর্ত-মানবতার সেবাধর্মে যুবনাশ্ব তার জীবনকে উৎসর্গ করবে। সে হুগলী মহসীন কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হল। মা আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার বড় হবার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক—তুমি যদি সত্যকার মানুষের মতো মানুষ হতে পার তা'হলেই শুধু আমার সব হারানোর খেদ মিটবে।

যুবনাশ্বের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে শয্যাশায়ী দাদু তাঁর সঞ্চিত ধনে তাকে একটি সাইকেল কিনে দিলেন। কলেজ অনেক দূরের রাস্তা, যুবনাশ্বের যেতে সুবিধা হবে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরবার পথে পাড়ায় ঢুকে যুবনাশ্ব দেখল সুরঞ্জনা দলছাড়া হয়ে একাএকা ফিরছে। যুবনাশ্বের বুকটা আনন্দে ঠেলে উঠল। সুরঞ্জনার পিছনে গিয়ে সে খুব জোরে বেল বাজিয়ে দিল।

সচকিতে পিছন ফিরে যুবনাশ্বকে দেখে সুরঞ্জনা বলল, কি অসভ্য ছেলে ছেলে বাবা! যা চম্‌কে উঠেছিলাম!

যুবনাশ্ব সাইকেল থেকে নেমে সুরঞ্জনার পাশে পাশে চলতে লাগল।

—আজ আমি প্রথম কলেজ করলাম রঞ্জনা।

—বেশ করলে। লীলাও তো তোমাদের সঙ্গে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে।

—শুধু লীলা কেন, যোগেশ হয়েছে, সুনীল হয়েছে, শ্যামল হয়েছে। দুবছর পরে তুমিও ভর্ত্তি হবে রঞ্জনা।

—হুঁ পাশ করতে পারলে তো!

—পাশ করবে না মানে? এবার এ্যানুয়েল পরীক্ষায় তুমি কতো ভালো রেজাল্ট করেছ, সেটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

—আমার পড়তে ভালো লাগে না—পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই—আমি স্কুল ছেড়ে দেবো।

যুবনাশ্বের বুঝতে বিলম্ব হল না যে তার উপর অভিমানে সুরঞ্জনা টইটম্বুর। আজ চারদিন হল সুরঞ্জনার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করা হয়নি। নতুন কলেজ, নতুন সাইকেল আর নতুন বই পত্তর যোগাড়ের হিড়িকে সুরঞ্জনাকে পড়িয়ে আসবার কথা মনে থাকলেও যুবনাশ্ব সময় করে উঠতে পারেনি। যুবনাশ্ব মিনতি-বিগলিত স্বরে বলল, বুঝেছি রঞ্জনা, তুমি আমার উপর রাগ করেছ। এই কদিন নানা কাজে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম—সব কথা শুনলে তোমার এতটুকু রাগও আর থাকবে না রঞ্জনা।

—থাক আর ওজর দেখিয়ে ওকালতি করতে হবে না।

—আমি এখনি তোমাদের বাড়ী যাচ্ছি রঞ্জনা।

—যেতে হবে না—কে যেতে বলেছে শুনি?

যুবনাশ্ব দুষ্টু হাসি হেসে বলল, কেন তুমি—

—ইস্‌, আমার ভারি বয়ে গেছে।

—বেশ বাবা বেশ—তোমাদের বাড়ী ঢুকতে না দাও সুশোভনা-দের বাড়ী যাবো—ওর সঙ্গে বেশ মজা করে গল্প করা যাবে'খন।

—কে তোমায় আমাদের বাড়ী যেতে মানা করেছে শুনি? কে কি বলেছে? সুরঞ্জনার অভিমান-বিক্ষুব্ধ চোখদুটি ছলছল করে উঠল: বেশ তো সুশোভনার কাছেই যাও। ওকে তো ভালো লাগবেই। বড়লোকের আদুরে মেয়ে—যেতে হবে না তোমায় আমাদের বাড়ী—

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ঘাড় ফিরিয়ে সুরঞ্জনা একরকম ছুটেই চলে গেল। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার গমনপথের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ল।

সন্ধ্যার নিবিড় আঁধার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাদের বাড়ী যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

—খোকা, কোথায় যাচ্ছিস্?

যুবনাশ্ব ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল।

—এই একটু এদিকে—মানে রঞ্জনাকে একটু পড়া দেখিয়ে দিতে।

মা মনে মনে বললেন, সুরঞ্জনা এখন তোমার কাছে রঞ্জনা হয়েছে—অনেক গড়িয়েছে দেখছি! মুখে বললেন, তোর নিজের পড়াশুনো নেই?

—এখনো ক্লাসে পড়াশুনো আরম্ভ হয়নি মা—তাছাড়া বইপত্তর সব এখনো যোগাড় হয়নি। রঞ্জনাদের বাড়ী থেকে ফিরেই আমি পড়তে বসব।

—হুঁ, আচ্ছা যাও।

মায়ের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে যুবনাশ্ব ফিরল।

—রঞ্জনাদের বাড়ী যাই বলে তুমি অসন্তুষ্ট হও মা? না হয় আমি আর ওদের বাড়ী যাবো না।

মা কাছে সরে এসে যুবনাশ্বের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,

দূর পাগল! আমি বুঝি তোকে ওদের বাড়ী যেতে নিষেধ করেছি? তবে এই বয়সে কারো সঙ্গে, বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করা ভালো না, ওতে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। আচ্ছা এখন যা, তাড়াতাড়ি ফিরিস।

সুরঞ্জনার ছোট বোন রাণুকে হাঁক দিয়ে যুবনাশ্ব বাড়ী ঢুকল। যুবনাশ্বের সাড়া পেয়ে রাণু ছুটে এলো। রাণুকে চকোলেট খাওয়ানো তার প্রাত্যহিকের প্রোগ্রাম।

—এসো বাবা যুবনাশ্ব! সুরঞ্জনার মা রান্নাঘর থেকে অভ্যর্থনা জানালেন। সুরঞ্জনা হ্যারিকেন জ্বেলে মাদুর পেতে বারান্দায় বসে পড়ছিলো। যুবনাশ্বের সাড়া পেয়ে আগে থেকে বেশবাস ঠিক করে নিয়ে যুবনাশ্বকে না দেখার ভান করে সে অংক কষায় গভীর ভাবে মনসংযোগ করল। চোখেমুখে কষ্টসৃষ্ট উপেক্ষার এমন একটা ভাব দেখালো যেন সে যুবনাশ্বকে দেখেইনি কখনো। চেনেই না একেবারে। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার পাশে গা ঘেঁসে বসল।

—কি অংক করা হচ্ছে? ইন্টারেষ্ট না টাইমএণ্ডওয়ার্ক?

সুরঞ্জনা কোনো উত্তর না দিয়ে যুবনাশ্বের দিকে পিছন ফিরে বসল। যুবনাশ্ব বুঝল অভিমানিনীর মান ভাঙ্গাতে হবে।

—তুমি বুঝি আমার সঙ্গে কথা বলবে না বলে পণ করেছ, রঞ্জনা?

সুরঞ্জনা তথাপি কোনো কথা না বলে অধিকতর ঝুঁকে পড়ে অংক করতে লাগল।

—ইন্টারেষ্টের অংক করছ বলে মনে হচ্ছে কিন্তু ইন্টারেষ্ট কষতে তুমি তো কোনো দিনই ইন্টারেষ্ট পেতে না। যাক্ তোমায় অংক টংক কিছু দেখিয়ে দিতে হবে রঞ্জনা?

—না কারো দরকার নেই, আমি নিজেই করতে পারব।

—অতি উত্তম! self-help is the best help. বেশ তবে চলি?

যুবনাশ্ব সত্য সত্যই উঠল।

—যেও না, মা হালুয়া করছে তোমার জন্যে, খেয়ে যেতে বলেছে।

—শুধু মা-ই খেতে বলেছে—মেয়ে নয়?

সুরঞ্জনা কোনো উত্তর দিল না।

যুবনাশ্ব পুনরায় বসে পড়ে বলল, তুমি তো আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না রঞ্জনা—খাবার দাবার কি নিয়ে আসবে বলছিলে—যাও তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

সুরঞ্জনা কোনো কথা না বলে উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা আর এক প্লেট হালুয়া এনে যুবনাশ্বের সম্মুখে নামিয়ে রাখল।

—এতো সব কি করেছ রঞ্জনা! এইমাত্র বাড়ী থেকে খেয়ে এলাম! এখন কি আবার এতো খাওয়া যায়?

—মা করেছে—আমি নয়। এতো কিছু নয়, খেয়ে নাও, না খেলে মা রাগ করবে। এতক্ষণে সুরঞ্জনা ভালো করে কথা বলল।

যুবনাশ্ব এদিক ওদিক তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়ে নীচুগলায় বলল, না খেলে মা-ই শুধু রাগ করবে—তুমি রাগ করবে না রঞ্জনা?

—করব—খুব রাগ করব—এখন খেয়ে নাও।

এরপর আর কিছু বলবার দরকার হয় না। হলও না। যুবনাশ্ব চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ইচ্ছা করেই নাক সেঁটকালো।

উৎকণ্ঠিতস্বরে সুরঞ্জনা বলল, চায়ে মিষ্টি হয়নি বুঝি?

—কে করেছে শুনি? যীশুর মতো অলৌকিক মুখোভাব করে বলল যুবনাশ্ব।

—চা-টা আমিই করেছি—সত্যি মিষ্টি হয়নি বুঝি?

যুবনাশ্ব দুষ্টুমিভরা স্বরে বলল, হয়েছে,তোমায় পরীক্ষা করছিলাম তোমার মিষ্টি হাতের স্পর্শ পেলে কালমেঘের তিক্ততা স্যাকারিণের

মিষ্টতা লাভ করবে। কিন্তু রঞ্জনা, তোমার হাতই শুধু মিষ্টি—মুখ মিষ্টি না।

—খালি দুষ্টুমি! সুরঞ্জনা হেসে ফেলল।

—তবু ভালো যে এতক্ষণে তোমার মুখে হাসি দেখলাম।

—আমি এখন উঠি রঞ্জনা?

—ইস, খেয়েই সরে পড়া। আমার পড়া না দেখিয়ে দিয়ে গেলেই হল আর কি! পা খোঁড়া করে দেবো না!

—দেখি কি সব করা হচ্ছে। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার কাছে সরে এলো।

গভীর অভিনিবেশ সহকারে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে উঠে পড়ল।

—যুবনাশ্বদা, তুমি বাড়ী যাচ্ছ? রাণু এসে যুবনাশ্বকে জড়িয়ে ধরল।

—হ্যাঁ রাণু চললাম—তোমার দিদি তো আর আমায় থাকতে বলল না। শেষের কথাগুলো যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল। সুরঞ্জনা দরজা পর্য্যন্ত এসে যুবনাশ্বকে এগিয়ে দিল।

—তুমি রাণুকে মিথ্যে কথা বললে কেন শুনি? আমি বুঝি তোমায় চলে যেতে বলেছি?

—চলে যেতে না বললেও, থাকতেই বা বললে কই? রাত হয়ে গেছে রঞ্জনা, আজ চলি, কাল আবার আসব কেমন?

—নিশ্চয়ই আসা চাই—না হলে সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেবো।

## পাঁচ

বাবুগঞ্জের বুড়োশিব জাগ্রত দেবতা। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে এখানে বিরাট মেলা বসে। পাড়ার পশ্চিম-প্রান্তে মাঠে যাত্রা হয়। আগে এখানে সাতদিন মেলা এবং তিন রাত্রি যাত্রা হত। এখন অবশ্য আগের মতো জাঁকজমক হয়না। পাড়ার বনেদী বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সংখ্যা এখন আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। যাদের দু'পয়সা হয়েছে তারা রাজধানীর সুযোগ সুবিধা থেকে দূরে সরে থাকতে চায়না বলে শাখাশিকড় ছিন্ন করে মহানগরীর পথে পাড়ি দিয়েছে। যারা অসহায়, আর অর্থনৈতিক মানদণ্ডের পরিমাপে অক্ষম তারাই অনন্যোপায় হয়ে অপরিহার্য্য ভাবে ভিটে-মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। এই চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় অনেকেই কয়েকদিনের জন্যে ছেড়ে আসা গ্রামের মমতায় এখানে ফিরে আসে আর সেই কটা দিন বিচিত্র প্রাণবন্যায় ফেনিল হয়ে ওঠে। অনেক দূর থেকে, সুদূর গঞ্জ থেকে ঠিকেদার ব্যবসায়ী আসে দোকান করবার জন্যে। আর এই কদিনের মেলা থেকেই তারা অঢেল পয়সা লুটে নিয়ে যায়। চন্দননগর থেকে আসে ভাড়াটে গুণ্ডা আর রাজাবাজার থেকে পকেটমার। নাগরদোল আসে, শুধু, ছেলেরাই নয়, নাগরনাগরীরাও তাতে দোল খায়। ঘন্টানাড়া ছোটখাটো সার্কাস আসে—পাড়ার ছেলেরদল সেখানে তীর্থের কাকের প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকে। চোখেমুখে তাদের অবাক পৃথিবীর অবাক বিস্ময়। দুটো একটা স্টুডিও আসে। কোনো কোনো বার তিনটে। সঙ্গে থাকে চিত্রবিচিত্র সিনসিনারী। স্থানীয় লোকেরা অনেকেই এসময়ে পুত্রকন্যাসমন্বিত সস্ত্রীক ছবি তোলে। আগে কয়েকবার ডায়নামো চালিত একটি চলচ্চিত্র কোম্পানী এসেছিল।

কয়েকবছর হল তারা আর আসছে না। পাড়ার পশ্চিমে পিপুলপাতি দরিদ্র বিগতযৌবনা গণিকাদের পল্লী। মেলার কয়েকদিন বহুস্থান থেকে মালদার লোকের সমাগম হয় বলে, কোথা থেকে কে জানে, কমবয়সী গণিকার আমদানীতে এপাড়ার আবহাওয়া সরগরম হয়ে ওঠে। কুঁড়েঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এরা বিড়ি টানতে থাকে। খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে দরজার পাশে কেউ কেউ হ্যারিকেন নিয়ে বসে। কেউ বা শিথিলচিত্ত প্রান্তিক পথচারীদের বিভ্রান্ত করবার জন্যে অনাবশ্যক-ভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আলোচনা ক'রে তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। মেলার দৌলতে কয়েকদিনের জন্যে হয় মানুষের বাড়াবাড়ি—আর রাতের আদিম আরণ্যক অন্ধকারে চলে মেয়েমানুষ নিয়ে অবৈধ্য কাড়াকাড়ি। সকালবেলায় এই সব ক্লান্ত গণিকাদের মুদীর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক পয়সার পান, দু পয়সার বিড়ি, তিন পয়সার চা আর চার পয়সার তেল কিনতে দেখা যায়। পেটমোটা দোকানদার ভোলামুদী হোঁদল কুতকুতের মতো চেহারা নিয়ে জলচৌকিতে বসে দাঁড়ি মাপে। এদের দেখে রসিকতা করে বলে, এসো, এসো, কি গো বাছা, কি চাই ?

—এক আনার তেল।

ভোলামুদীর অভিলাষ যে মেয়েমানুষটা তেল কিনেই তাড়াতাড়ি চলে না যায়, কিছুক্ষণ তার সঙ্গে দরাদরি, বাদানুবাদ আর খোসগল্প করে কাটাক। তেল একটু কম করেই সে দেয়।

—এই নাও।

—এই এক আনার তেল! তুমি যে দিনে দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করলে দোকানী। তোমার দোকানে আর আসব না।

—বলি বাছা রাগো কেন ? তোমরাও যেমন দু পয়সা নেবার জন্যে বসে আছ, আমরাও তেমনি দু পয়সা আশা করি তো!

—পয়সাকড়ি রোজগার আর হচ্ছে কোথায় বল দোকানী! কালরাতে মোটে চারটে মিন্‌সে এসেছিল। মোট হয়েছে তেরো টাকা তিন আনা—জমানা বহুৎ খারাব হ্যায়।

দোকানদার শিশিতে বেশ খনিকটা তেল ঢেলে দিল যার দাম চার পয়সার অনেক বেশী কারণ সে জানে এ খোদ্দেরকে তেল দিয়ে লাভ আছে।

পরম পরিতৃপ্তিতে একগাল হাসি হেসে পান দোক্তায় ছোপ ধরা দাঁতগুলো বার করে কল্‌নিসের বিজ্ঞাপন জাহির করল মেয়েমানুষটা: দোকানী ঠিক দিয়েছ এবার। এই যে দাগ দেখছ ওই দাগ পর্য্যন্ত চার পয়সা—আমার যে মাপ আছে।

—তা তোমার কোথা থেকে আসা হচ্ছে গা?

—চন্দননগরের গঞ্জে থাকি—হাসিনা বিবিকে ওখানের সবাই চেনে।

—থাকবে কদিন?

—মেলা শেষ হলে যাবো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে আশেপাশে কাউকে না দেখে আশ্বস্ত হয়ে ভোলামুদী নীচু গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বলি, তোমার দক্ষিণে কতো?

—তিনটাকা আর ঝিয়ের চার আনা। তা তুমি যখন পুরোনো লোক, না হয় পুরোপুরি তিনটাকাই দিও।

—আজ রাত্তির দশটার সময় দোকান বন্ধ করে যাবো—ঘর খালি রেখো।

কামাল কিয়া। হাসিনাবিবি হাঁস্‌লি দুলিয়ে কাজ হাঁসিল করা হাসি হেসে চলে গেল।

সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে রয়েছে এই হাসিনা বিবির দল। রাত্রির তপস্যাশেষে বৈশ্যসভ্যতার এ কলঙ্ক ঘুচে কবে হবে দিন?

শুধু ভোলামুদীই হাসিনাবিবির কৃপাপ্রার্থী নয়। পাড়ার

অনেক কেষ্টবিষ্টু ব্যক্তিরও যে ম-কার দোষ আছে এ সংবাদ যুবনাশ্ব পাড়ার সর্বজনীন হরিদার কাছ থেকে পেয়েছে। যুবনাশ্ব যখন কলকাতা থেকে বাবুগঞ্জে এসে ডাফ্ স্কুলে ক্লাশ টেনে ভর্ত্তি হল তখন হরিদা পরপর চার বছর ম্যাট্রিকুলেশানে সাফল্যের সঙ্গে অকৃতকার্য্য হয়ে পঞ্চমবারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। পিচ্ছিল যৌবনের রন্ধ্রপথে হরিদার কৌমার্য্য অপহৃত। ইতিপূর্বে তার পানদোষ ঘটেছিল। মা অনেক বকাবকি করেছিল সে জন্যে। মায়ের প্রাণত্যাগের পর অবশ্য হরিদা পানত্যাগ করেছিল। হরিদার বয়সের ছেলেরা অবশ্য স্কুলে পড়েনা—বি. এ. পাশ করে, অফিসে চাকরী করে। বিশ্ববয়াটে হরিদা সম্প্রতি বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। পাড়ার বেপাড়ার সবাই তাকে ভয় খায়। হরিদার আঞ্চলিক জনপ্রিয়তাও অবশ্য কম নয়। হরিদার এক আশ্চর্য্য আকর্ষণীশক্তি আছে, সেটা হচ্ছে তার বিচিত্র অভিজ্ঞাতার সরস বর্ণনা করবার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা। ভালো ছেলে বলে খ্যাতি থাকায় হরিদা যুবনাশ্বকে বেশ ভালোই বাসত। হরিদাকে যুবনাশ্বেরও মন্দ লাগত না। মানুষের নিজ্ঞান মনের সক্রিয় অপরাধপ্রবণতার জন্যেই বোধ হয় হরিদাকে যুবনাশ্বের ভালো লাগত। তাছাড়া, ভালো লাগবার মতো কিছু গুণ হরিদার নিশ্চয়ই আছে। পাড়ার এমন একটা লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কোনো না কোনো ভাবে হরিদার কাছ থেকে উপকার পায়নি। পাড়ার পদীপিশির কালোমেয়ে খেঁদীর পাত্র জুটলেও টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না শুনে হরিদাই বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসার হিম্মৎ রাখে। বিধবা পদীপিসিকে সান্ত্বনা দিয়ে হরিদা বলে, পিসি,তুমি কিছু ভেবোনা—আমি খেঁদিব বিয়ের টাকা যোগাড়ের ভার নিচ্ছি। সাতদিনের মধ্যেই হরিদা চ্যারিটি শোয়ের ব্যবস্থা করিয়ে পাঁচশো টাকা সংগ্রহ করে পদীপিসির হাতে তুলে তাকে আশ্চর্য্য করে দিল। সজল চোখে আশীর্বাদ করে বিধবা বলে, বাবা, তুমি শতায়ু হও। বিয়ে হয়ে গেলে পর অবশ্য খেঁদী

মাকে বলেছিলো, হরিদার মুখে মুড়ো ঝাঁটা। কিছু না নিয়ে ও বুঝি অম্‌নি অম্‌নি টাকা দিয়েছিলো, ভাবো? নিঃস্বার্থভাবে ভালো কাজও হরিদা করে বৈকি। গাছ থেকে পড়ে কার পা ভেঙ্গেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না, ডাকো হরিদাকে। গাঁয়ের শেষে নগেন চাঁড়ালের বউ মরেছে—দাহ করবার লোক মিলছেনা, ডাকো হরিদাকে। হরিদাকে কোনরকমে একবার সংবাদ পৌঁছে দিতে পারলেই সব দুর্ভাবনার অবসান।

হরিদা সারাপাড়াটা ঘুরে ঘুরে মেলা তদারক করছিল। যুবনাশ্বকে দেখে পকেট থেকে কিছু বাদাম বার করে বললে, good news, এইনে বাদাম খা, good boy.

যুবনাশ্ব হরিদার কাছ থেকে কতকগুলো চিনাবাদাম হাত পেতে নিল। হরিদা চিনাবাদাম চিবুতে চিবুতে বলল, ওই দেখ্, সতু পণ্ডিত দূর থেকেই আমায় দেখে পালিয়ে যাচ্ছে। গত বছর মেলার সময় সেই কাণ্ডটা হয়ে যাবার পর থেকে সতুপণ্ডিত আর মুখ তুলে আমার দিকে তাকাতে পারে না—আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে যায়—আমার সাম্‌নে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

গতবারের মেলায় কি ব্যাপার ঘটেছিল যুবনাশ্ব জানত না। সে নির্বোধ দৃষ্টিতে হরিদার দিকে তাকিয়ে বলল, গতবারের মেলার সময় কি হয়েছিল?

—Good News! রাজ্যশুদ্ধ সবাইকে বলেছি, আর তুই জানিস না? তুই একবারে hopeless! শোন তবে বলি।

হরিদা বুক ফুলিয়ে বাহাদুরী নেবার ভঙ্গীতে যেটা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে এই: গত বছর চৈত্রসংক্রান্তির দিনে টেঁপি নামে এক মেয়েমানুষের আমদানী হয়েছিল। তার বয়স ত্রিশের নীচে, চেহারা হৃষ্টপুষ্ট আর চোখের দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত মোহের আশ্চর্য্য ধারাল আকর্ষণ। বিকেল বেলায় ওই রাস্তা দিয়ে চলবার সময়

হরিদা টেঁপিকে খাপিতে বসে পাশের দোকানের চা ওলার সঙ্গে খোসগল্প করতে দেখেছিল। হরিদার ষণ্ডামার্কা বিপুল চেহারা আর বিস্তৃত বুকের পেশল ছাতি দেখে নাকি টেঁপি চোখ ঠেরে ফিক্ করে হেসে ইঙ্গিত করেছিল। ফলে টেঁপির হাসিতে সেদিন রাত্রেই হরিদার পদস্খলন হল। অবশ্য এই প্রথম নয়। কোথায়, কবে, কেমন করে, কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেসব কথা শ্রীমান সগর্বে তার বন্ধুমহলে প্রচার করে থাকেন। যাইহোক, যখন টেঁপিকে নিয়ে হরিদা স্বর্গসুখ উপভোগ করছিলো এমন সময় দরজায় দুর্বল হাতের টোকা পড়ল আর ফিস্ ফিস্ কণ্ঠের আওয়াজ এলো, টেঁপি, আছিস নাকি ?

—আছি, দাঁড়াও। টেঁপি হরিদার দিকে চেয়ে বলল, আজ এখন যাও, তোমার সময় শেষ হয়ে গেছে—আমার অন্যলোক এসেছে।

টেঁপি দরজা খুলতেই এক অভাবনীয় নাটক ঘটে গেল। সংস্কৃতের সতু পণ্ডিত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রায়বৃদ্ধ এই—ভদ্রলোকটি কখনো মুখতুলে কারো দিকে তাকান না। ছাতাটি বগলে গুঁজে গায়ে নামাবলী চড়িয়ে তিনি স্কুলে আসেন আর যান। ভদ্রলোকের বারোটি ছেলেমেয়ে। মানে দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রীকে রীতিমত উপভোগ করেছেন তবুও ঘোড়ারোগ সারেনি। হরিদা তাড়াতাড়ি কাপড়জামা ঠিক করে নিয়ে বলল, নমস্কার স্যার—আমি হরি—আপনার ছাত্র—। সতু পণ্ডিত নামাবলী ফেলে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দে ছুট—দে ছুট্। পিছন থেকে হি হি করে হরিদার সে কী একচোট হাসি। কাহিনী শেষ করে হরিদা বলল, ও রকম জব্দ সতু পণ্ডিত আর কখনো হয় নি।

কুকুর এসে মানুষকে কাম্ড়ালে সেটা হয় ঘটনা আর মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা হয় news. এমন একটি বিচিত্র সংবাদ পেয়ে যুবনাশ্ব আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। হরিদার গণিকাবাড়ী

যাওয়া নয়—সতু পণ্ডিতের নৈশ বিহারই তার কাছে news বলে মনে হয়েছিল।

মেলার দ্বিতীয় দিনে সুশোভনা, লীলা, সীতা প্রভৃতি পাড়ার মেয়েরা বিকালবেলা দলবেঁধে মেলা দেখতে বেরিয়েছে শুনে সুরঞ্জনাও রাণুকে নিয়ে যুবনাশ্বের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। সে সবাইকে সগর্বে দেখাতে চায় পাড়ার সেরা ছেলে যুবনাশ্ব তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সে শুধু একান্ত তার। সুরঞ্জনাকে যুবনাশ্বের সঙ্গে দেখে সুশোভনা, লীলা, সীতা সব গা টেপাটিপি করে মুচকী হেসে নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন সব বলাবলি করল। যুবনাশ্বের চোখে অবশ্য এই সব সূক্ষ্ম মেয়েলি জিনিষ ধরা পড়ে না। কিন্তু সুরঞ্জনার চোখ দুরবীন—সেখানে কিছুই এড়ায় না। রাণু খেলনার দোকানে এটাওটা হাত দিয়ে নেবার জন্যে বায়না ধরছিল কিন্তু দিদির দাবড়ানির চোটে তার স্বৈরাচারী মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছিল। সুরঞ্জনা একটা পাখা কেনবার জন্যে দরদস্তুরী করছিল। কিছুদূরে দেখা গেল হরিদা তার কয়েকজন সিনিয়ার সাকরেদ নিয়ে জটলা করছে। যুবনাশ্বকে দেখতে পেয়ে হরিদা দূর থেকে তাকে হাত নেড়ে ডাকল।

—তুমি পাখা দেখো রঞ্জনা, আমি হরিদার সঙ্গে একটু কথা বলে আসি—দেখি ও ডাকছে কেন।

—দেরী করবেনা—তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।

যুবনাশ্ব হরিদার কাছে এসে বলল, কি খবর হরিদা?

—Good news! খবর আবার কি? রথ দেখছি আর কলা বেচছি। তা good boy, তুই হঠাৎ পড়া ছেড়ে মেলায় এলি যে বড়?

—সুরঞ্জনার মা একটা পাখা কেনবার জন্যে সুরঞ্জনাকে মেলায় পাঠিয়েছে আর আমি ওর গাইড হয়ে এসেছি। যুবনাশ্ব হেসে বলল।

—Good News! সত্যি মাইরি, সুরঞ্জনার মা বেছে বেছে তার সোমত্ত মেয়ের জন্য তোকেই গাইড করল? লাকি চ্যাপ তুই যুবনাশ্ব! দেখিস, শেষকালে যেন পাকা আমের মতো টুক করে খেয়ে ফেলিস না। যাই বলিস মাইরি তোর choice-এর তারিফ না করে থাকা যায় না—এ তল্লাটে সুরঞ্জনার মতো ছুঁড়ির জুড়ি মেলা ভার। আঃ! বিচিত্র শব্দ করে জিব দিয়ে হরিদা তার ঠোঁট চেটে নিল।

হরিদার ইতরামি আর অশ্লিল ইংগিত সবসময় যুবনাশ্বের ভালো লাগেনা। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি বলল, এবার পরীক্ষা দিচ্ছ তো হরিদা? তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে?

—গুলি মার লেখাপড়ায়। আমি গোবর খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি আর ওপথ মাড়াচ্ছিনা। বাপ ঘিয়ে চর্বি ভেজাল দিয়ে আর চালে কাঁকর পাইল করে যা পয়সা করেছে ওতে আমার তিনপুরুষ ঠেঁপিকে বাঁধা রেখেও পায়ে পা দিয়ে খাবে। এখন lifeটা enjoy করতে হবে বুঝলি? Good News! দেখি পিপুলপাতিতে কটা মাগী এলো—এই সব আয়। হরিদা তার সামন্তসাকরেদ নিয়ে গণিকাপল্লীর দিকে নতুন আমদানীর খোঁজে চলে গেল।

কেনাবেচা শেষ করে সুরঞ্জনা আর রান্নুকে নিয়ে যুবনাশ্ব বাড়ীর পথে ফিরল। সোনালী গোধূলির বুকে বর্ণ-বিদীর্ণ সন্ধ্যা। এক নতুন স্বপ্নভরা দৃষ্টি দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়া সূর্যকে দেখে যুবনাশ্ব বলল, লাল মেঘের মধ্যে সোনার ডিমের মতো অস্তগামী সূর্য কি অপূর্ব তাই না রঞ্জনা?

—কেন, সূর্য কি আজ নতুন উঠেছে নাকি? ও তো রোজই এমন করে পশ্চিম আকাশ রাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়।

যুবনাশ্ব ক্ষুব্ধ হল। মেয়েগুলো বড় বেশী প্র্যাকৃটিক্যাল। এতটুকু রোমান্টিক হতে জানে না। হেসে বলল, সূর্য রোজই এমন

ভাবে পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু দেখবার মতো চোখ আর উপলব্ধি করবার মনতো সবার সবসময় থাকে না—তুমি পাশে আছ বলেই বোধ হয় সূর্যকে এতো ভালো লাগছে।

—সব তাতেই তোমার কাব্য আর বাড়াবাড়ি। চুপ কর, পেছনে পাড়ার সব আসছে। সুরঞ্জনা তার মুখের উপর তর্জনী তুলে যুবনাশ্বকে স্নেহ-শাসন করল।

জীবননদীর স্রোতে দুটো বছরের ঢেউ গড়িয়ে গিয়ে জীবন নাট্যের নতুন অংকের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। যুবনাশ্বের শয্যাশায়ী দাদু মারা গেছেন। মর্মে মর্মে বহমান সুরঞ্জনার সুগভীর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত যুবনাশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনল লরেল পাতার জয়মাল্য। আই এস. সিতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে সে বি. এস. সি পড়ছে। মেডিক্যাল পড়বার অদম্য সাধ থাকলেও মায়ের আর্থিক সাধ্যে সঙ্কুলান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত যুবনাশ্বকে কেমিষ্ট্রী অনার্স নিয়ে বি.এস সিতেই ভর্ত্তি হতে হল। সুরঞ্জনাও ভালো ফার্ষ্ট ডিভিসানে পাশ করে মহসীন কলেজে প্রথম বার্ষিক সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হল। সুরঞ্জনার মা মেয়েকে কলেজে পড়াতে খুব উৎসাহ প্রকাশ করেননি কিন্তু যুবনাশ্বের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন।

—সত্যি রঞ্জনা, তুমি যে এতো ভালো রেজাল্ট করবে এ আমি কল্পনাই করতে পারিনি। সুরঞ্জনার পাশে বসতে বসতে যুবনাশ্ব বলল।

—ভালো না ছাই।

—ভালো না মানে ? তুমি ক্লাশ সেভেনে একবার ফেল করেছ—ক্লাশ এইটেও তুমি অংকে চার পেয়েছিলে এ আমার বেশ মনে আছে। চার পাওয়ার পর পড়াশুনোয় কতখানি চাড় পড়লে তবে ম্যাট্রিকুলেশানে ফার্ষ্ট ডিভিসান পাওয়া যায় বলত ?

অপাঙ্গে বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে সুরঞ্জনা বলল, যেটুকু কৃতিত্ব সেও আমার নয়, আমার মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে ধার করা—অমন ভালো মাষ্টার পেলে অন্য মেয়ে হলে কতো ভালো রেজাল্ট করতে পারত।

যুবনাশ্ব হেসে বলল, এমন ছাত্রী পাওয়াও কি কম সৌভাগ্যের কথা ?

—পাওয়া বললে ভুল হয়, আবিষ্কার বল। আমাকে তো তুমি পাওনি, আবিষ্কার করেছ আর তোমার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমিও নিজেকে আবিষ্কার করেছি। তোমার মধ্য দিয়েই তো আমি আমাকে নতুন করে জানতে শিখেছি, চিনতে পেরেছি।

আজকাল সুরঞ্জনা ভারী সুন্দর করে কথা বলতে পারে ! যুবনাশ্ব কৌতুকদীপ্ত চোখে সুরঞ্জনাকে দেখে।

—রঞ্জনা। স্বপ্নভরা কণ্ঠে যুবনাশ্ব ডাকল।

—অতো গৌরচন্দ্রিকা না করে বলেই ফেলোনা কি বলবে ?

—তুমি আজকাল ভারী সুন্দর হয়েছ রঞ্জনা—গালদুটো আপেলের মত লাল টকটকে হয়েছে।

সুরঞ্জনা লজ্জা পেল। আজকাল সে লজ্জা পায়।

—তুমি বোসো, আমি চা নিয়ে আসি। সুরঞ্জনা তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, জানো রঞ্জনা, তুমি ছাড়া আর কেউ আমার গিন্নী হবে এ আমি ভাবতেই পারিনা।

—আমিও না। তুমি তো জানো যুবনাশ্ব, তোমার ভাবনা, তোমার ছবি আমার দেহের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে।

তোমাকে বাদ দিয়ে আমি আমার অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারিনা যুবনাশ্ব—কিন্তু—

—কিন্তু কি রঞ্জনা ?

—তুমি ভালোছেলে, পড়া শেষ হলে নিশ্চয়ই তুমি ভালো চাকরী পাবে তখন কতো ধনবান লোকের মেয়ের সম্বন্ধ তোমার আসবে—পাঁচ দশ হাজার টাকা পণ নিশ্চয়ই পাবে—কিন্তু আমরা কতো গরীব সে তো তুমি জানো—আমার মায়ের এক কানাকড়ি দেবারও সামর্থ্য নেই।

—তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পেরেছি রঞ্জনা।

—মনে থাকে যেন আমাকে বিয়ে করলে ঠক্‌তে হবে—এক কানাকড়িও আসবেনা কিন্তু—

—হিসাবে তোমার ভুল হয়ে গেল রঞ্জনা। অন্য মেয়ে বিয়ে করলে পাব দশ হাজার আসল—তোমার কাছ থেকে দশ হাজার শুধু সুদেই পাবো—সুদেআসলে আরো কতো বেশী পাবো ভাবো দিকি।

যুবনাশ্বের বক্তব্য বুঝতে না পেরে সুরঞ্জনা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। যুবনাশ্ব আদর করে সুরঞ্জনার চিবুক নেড়ে দিয়ে বলল, ডোমেস্টীক সায়েন্স নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছ, হিসাবের এসব জটিল ব্যাপার তুমি বুঝবে না রঞ্জনা। রান্নু আসছে এদিকে, ও কথা থাক।

সুরঞ্জনা আঠারো ছাড়িয়ে উনিশে পা দিয়েছে অর্থাৎ কিনা মফঃস্বল শহরের রীতি অনুসারে মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। কানাঘুসোয় এমন দুচারটে কথাও শোনা যাচ্ছে সেগুলো মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় সুরঞ্জনা যুবশ্বনাকে সরাসরি বলল, দেখো, এই রকম ধরি মাছ না ছুই পানি আর বেশী দিন চলেনা।

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না রঞ্জনা।

—আমার বিয়ের ঘন ঘন সম্বন্ধ আসছে। এইবার বুঝেছ তো?

—এ্যাঁ! পথ চলতে চলতে অতর্কিতে কাঁটা বিঁধে গেল পায়। উদ্‌ভ্রান্ত যুবনাশ্ব আঁত্‌কে উঠে বলল, তুমি কি বলছ রঞ্জনা।

—বাবা! বলছি যে আমার বিয়ে হবে তাই সব মেয়ে দেখতে আসছে। বলি, আমি কি চিরকাল আইবুড়ো হয়েই থাকব?

—কিন্তু—কিন্তু—

যুবনাশ্বের দুরবস্থা দেখে হেসে ফেলল সুরঞ্জনা।

—বলনা কিন্তু কি? আশ্চর্য অলৌকিক শোনাল সুরঞ্জনার কণ্ঠস্বর।

যুবনাশ্ব চিত্তচাপল্য সংহত করে সংযত হল।

—না, কিছুনা—মানে তোমার পড়াশুনো এখনো শেষ হয়নি —তাই বলছিলাম—

—পড়াশুনো তো কোনোদিন শেষ হয় না যুবনাশ্ব। জ্ঞান-ভাণ্ডার যে অফুরন্ত।

—তুমি বিয়ে করবে রঞ্জনা? যুবনাশ্বের চোখেমুখে নিরুদ্ধ হৃদয়ের নিগূঢ় আকূতি ফুটে উঠল।

যুবনাশ্বকে মোহ-মদির, রহস্য-গভীর বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে সুরঞ্জনা বলল বারে বিয়ে করবনা কেন? আমাকে তুমি বিয়ে করতে মানা করছ—আচ্ছা স্বার্থপর ছেলে তো তুমি!

—না না আমি মানা করছিনা রঞ্জনা—তুমি আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা কোরোনা লক্ষীটি।

হেসে ফেলল সুরঞ্জনা।

—বুঝতে পারিনি তোমার অবস্থা এতোখানি খারাপ!

—ঠাট্টা করছ রঞ্জনা।

—তুমি আমার মাষ্টারমশাই, তোমার সঙ্গে বুঝি আমি ঠাট্টা করতে পারি। বোসো, আমি চা নিয়ে আসি।

কিছুক্ষণ পরে সুরঞ্জনা চা নিয়ে এলো। চিন্তামগ্ন যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার হাত থেকে চায়ের কাপ টেনে বলল, বোসো রঞ্জনা, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সুরঞ্জনা পা মুড়ে যুবনাশ্বের পিঠে ঠেস্ দিয়ে বলল, বল কি সব তোমার অনেক কথা বলবার আছে।

—তুমি আমায় ভালবাসো রঞ্জনা?

সুরঞ্জনা চারিদিক দেখে নিয়ে আশ্বস্ত হল নিকটে কেউ নেই।

যুবনাশ্বের গাল টিপে তার কানে কানে চণ্ডীদাসীসুরে বলল, পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর আমার ভুবনে আনিল কে? সহসা গম্ভীর হয়ে সুরঞ্জনা বলল, তোমায় একটুও ভালবাসিনা।

—ইস্ তুমি না সেদিন বলেছিলে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না?

—সে বলেছিলাম শুধু তোমায় সান্ত্বনা দেবার জন্যে। অন্য কাউকে বিয়ে করলে তুমি যে হার্টফেল করবে।

—ইস্ তুমি ছাড়া যেন বিশ্বজগতে বিয়ে করবার মতো মেয়ে আর নেই।

—ইস, তুমি ছাড়া যেন ভালছেলে ত্রিভুবনে আর নেই।

—বেশ তো, আমাকে ছাড়া তুমি আর কাকে ভালোবাসো বল।

সুরঞ্জনা গম্ভীরমুখে বলল, রান্নুকে ভালবাসি, মাকে ভালবাসি, দাদাকে ভালবাসি।

যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার গম্ভীর মুখের হাল্কা কথায় হো হো করে হেসে উঠল। সুরঞ্জনাও অবশ্য সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারল না। হাসির ফোয়ারা থামিয়ে যুবনাশ্ব বলল, ও সব ভালবাসা নয়—আমি প্রেম ভালবাসার কথা বলছি।

—বিলিতি কায়দায় আমাদের দেশে প্রেম করে তো আর বিয়ে হয়না—বিয়ে করেই প্রেম হয়। দুষ্টু মেয়েরাই শুধু বিয়ের আগে প্রেম করে।

—তোমার থিয়োরী অনুযায়ী তুমি হলে এক নম্বর দুষ্টু মেয়ে।

সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে বলল, আমাকে দুষ্টু করেছে কে শুনি? বাজে কথা থাক, মা আমার বিয়ের জন্যে যেমন উঠে পড়ে লেগেছে তাতে মনে হয় আগামী ফাল্গুনে আমার অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে বসন্ত জাগিয়ে ছাড়বে।

—আচ্ছা রঞ্জনা, আমাদের এই মেলামেশা, এই ঘনিষ্ঠতা দেখেও মাসীমা বুঝতে পারেন না যে আমরা পরস্পর পরস্পরকে চাই—দুজন দুজনকে ভালবাসি?

—মা সবই বোঝেন। কিন্তু তুমি এখন ছাত্র, তোমার চেয়ে উপার্জনক্ষম পাত্রের বাজার দাম নিশ্চয়ই বেশী—তাছাড়া—

—তাছাড়া আবার কি রঞ্জনা?

—শান্তি মাসী রাজী হবেন কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

—আমার মাকে রাজী করানোর ভার আমার।

—বেশ তো তুমি তোমার মাকে রাজী করাও—আমি আমার মাকে রাজী করবো। এই চুপ, মা আসছে এদিকে।

—বারে, তুমিই তো কথা বলছ—চুপ তো তুমিই করবে।

## ( সাত )

সেদিন রাত্রে সুরঞ্জনাদের বাড়ী থেকে ফেরবার পথে যুবনাশ্ব আসন্ন সংগ্রামের জন্যে মনে মনে প্রস্তুতির মহড়া দিল। রাশভারী কড়ামেজাজী গম্ভীর প্রকৃতি মায়ের কাছে কি করে নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিজের মুখে করবে ভেবে পায় না যুবনাশ্ব। যাই হোক মনে মনে মরিয়া হয়ে রইল আসন্ন সুযোগ প্রতীক্ষায়। বি. এস. সি পাশ করে একটা চাকরী বাকরী জোগাড় না করা পর্যন্ত মা যে তার

বয়ে দিতে রাজী হবে না একথা যুবনাশ্ব ভালভাবে জানে। কিন্তুই সেও তো এখনি সুরঞ্জনাকে বিয়ে করতে চাইছে না। মা মুখফুটে কথা দিলেই যথেষ্ট। মাকে ব্যাপারটা খুলে বলা যত সোজা ভেবেছিল যুবনাশ্ব, কার্যতঃ দেখা গেল সেটা আদৌ সহজ নয়। বলি বলি করে যুবনাশ্ব সত্যসত্যই তার মনোভাব বলে উঠতে পারলনা। ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল যার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না।

কয়েকদিন ধরেই মায়ের সামান্য জ্বর হচ্ছিল। যুবনাশ্ব ডাক্তার ডাকবার প্রসঙ্গ তুললেই মা হেসে সে কথা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আমার জীবনের কি এমন মূল্য যে ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে?

যুবনাশ্বের দুচোখ জলে ভরে গেল। বাবা মারা যাবার পর থেকে মা যেন কেমন হয়ে গেছেন। হেসে কথা বলতে প্রায় ভুলে গেছেন। নিঃশঙ্ক তাই নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে ভালবাসেন। নির্জনে একা কি সব কথা বলেন। নারীর জীবনে প্রেমিক স্বামীর শূন্য স্থান কি কেউ পূর্ণ করিতে পারে না? যুবনাশ্ব মায়ের গালে তার গাল ঘসতে ঘসতে বলল আমার কাছে তোমার জীবনের কি দাম, কেমন করে সে কথা বোঝাব তোমায় মা?

মা বিষাদখিন্ন হাসি হেসে বললেন, ডাক্তারবদ্যিকে পয়সা দেবার মতো কিছু কঠিন রোগ আমার হয়নি খোকা।

মায়ের মাথার রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে যুবনাশ্ব বলল, আজ পাঁচদিন হল জ্বর ছাড়ছেনা—এ আমি ভালো বুঝছিনে মা।

—বাজে সময় নষ্ট না করে পড়গে যা খোকা—সাম্‌নেই তোর ফাইন্যাল পরীক্ষা। আচ্ছা আচ্ছা, কাল সকালে জ্বর না ছাড়লে শেখর ডাক্তারকে একবার খবর দিস। এখন যা, পাগল ছেলে।

চোখে মুখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুবনাশ্ব উঠে গেল। পরের দিন ভোরে দুধ গরম করে মায়ের বিছানার মাথার কাছে সরে এসে দাঁড়াল।

—মা তোমার জন্যে দুধ গরম করে এনেছি—কাল সারাদিন তুমি কিছু খাওনি—এই দুধটুকু খেয়ে নাও মা। লক্ষ্মী মা আমার!

কোনো সাড়া এলোনা। উত্তর মিললনা। হঠাৎ যুবনাশ্বের হৃদপিণ্ডটা ধ্বক করে উঠল। একটা খারাপ সন্দেহ বিদ্যুৎগতিতে মাথায় চিড়্ খেয়ে গেল।

—মা—মা—

প্রায় অন্ধকার ঘরের ইথার তরঙ্গে যুবনাশ্বের কথার প্রতিধ্বনি গুম্‌রে উঠল—মা—মা—

যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জানলা দরজা সব খুলে দিল। আলোর বন্যায় ঘর ভেসে গেল।

—মা—মা—মাগো—সাড়া দাও—কথা কও—

উন্মাদের মতো যুবনাশ্ব মায়ের কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, মাগো আমার, তুমি কথা বল মা—কাল রাতে তুমি আমার সঙ্গে যেমন করে কথা বলেছিলে তেমন করে কথা বল মা—সাড়া দাও—

অনুভূতিহীন নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ, শবদেহ এতটুকু বিচলিত হলনা। দুঃসংবাদ দ্রুতগামী। পাড়ার ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সবাই ছুটে এলো। সান্ত্বনাবাণীর বাণ ডেকে গেল। মানুষের অমোঘ নিয়তির নিষ্ঠুর শাসনের কথা বলে বয়োজ্যেষ্ঠরা দার্শনিকতার পরিচয় দিলেন। বষিয়সী স্ত্রীলোকেরা নিজেদের মধ্যে সবিস্তারে সালঙ্কারে শান্তির গুণের কথা উল্লেখ করতে লাগল।

—অমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে আজকালকার দিনে চোখে দেখা যায় না। সত্যি দিদি, যেমন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো রূপ তেমনি ব্যাভার। অমন মেয়ে কি সোয়ামী ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারে?

যারা লুকিয়ে বলাবলি করত, দেখোনা শান্তিটা রাঁঢ় হয়ে দিন দিন যেন ষাঁড় হচ্ছে, আজ তারাও সত্যি সত্যিই চোখের জল মুছল। যারা শান্তির ছেলের পরীক্ষার সাফল্য আর জলপানি পাওয়ার কথা শুনে ঈর্ষায় জ্বলেছে তারাও আজ সহানুভূতি দেখাতে

কসুর করল না। এমনভাবেই বোধহয় যুগে যুগে মৃত্যুনদীর তীরে শত্রু জয় করে মানবতার শূন্য-শ্মশান মিত্রময় হয়ে ওঠে।

অপ্রত্যাশিত আঘাতের আত্যন্তিকতায় বিমূঢ় যুবনাশ্ব তার সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। তার চোখের জলও বাষ্প হয়ে শুকিয়ে গেছে। এরা ওরা ও আরো অনেকে এলো এবং অনেকের মতো সুশোভনাও এলো।

—যুবনাশ্বদা—

ভাবলেশহীন অভিব্যক্তিশূন্য মুখ তুলে যুবনাশ্ব সুশোভনার দিকে তাকালো। সুশোভনা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। জীবন্ত মানুষের ব্যথা-বিমলিন চোখেমুখে এতখানি বিষাদখিন্ন বেদনাবিধুরতা সে দেখে নি। নত নয়নের পক্ষ তিমিরে স্তিমিত বেদনাধারার বাঙ্ময় বিচ্ছুরণ।

—আমায় একা ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মা আমার চলে গেছে সুশোভনা—

কোন অতল পাতালের রহস্য গভীর গহ্বর থেকে ভেসে আসা ভৌতিক কণ্ঠস্বর। একি যুবনাশ্বের গলা নাকি? সুশোভনা ভীত হল। যুবনাশ্বদা পাগল হয়ে যাবে না তো? নিকট জনের মতো সান্ত্বনা দিল সে ঃ যুবনাশ্বদা, তুমি বিদ্বান-বুদ্ধিমান ছেলে—তুমি এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন বল? তোমায় মামুলি কথায় ভোলাতে চাই না আমি—তুমি ওঠো যুবনাশ্বদা—সব কাজ যে বাকী।

সবার শেষে আস্তে আস্তে সুরঞ্জনা এলো। যুবনাশ্বের সন্নিকটে সুশোভনাকে বসে থাকতে দেখে তার চোখে মুখে একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা ঘনীভূত হয়ে উঠল।

—যুবনাশ্ব—

—এসো রঞ্জনা—

যেদিকে সুশোভনা বসেছিল সুরঞ্জনা তার বিপরীত দিকে গিয়ে বসল।

—এই বিশাল পৃথিবীতে আমায় একা অসহায় রেখে মা আমার চলে গেছে রঞ্জনা—আজ আমি বড় একা—বড় নিঃস্ব—আমার আপনার বলবার কেউ আর নেই রঞ্জনা।

—আমি—আমরা তো আছি যুবনাশ্বদা। ছলছল চোখে সুশোভনা যুবনাশ্বকে সান্ত্বনা দিল।

—যুবনাশ্ব কোথায় রে?

সবাক অস্তিত্ব ঘোষণা করে সশব্দে হরিদা এসে হাজির হল। হরিদার সাড়া পেয়ে যুবনাশ্ব ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—হরিদা আমার মা মারা গেছে।

—Good News! মানে, আই মিন ভেরি ব্যাড নিউজ। আরে সেই খবর পেয়েই তো আসছি। তোর ব্যাড লাক যুবনাশ্ব, এই বয়সেই বাপ-মা সব খেয়ে বসলি!

—সেটা কি আমার দোষ হরিদা?

—নিশ্চয়ই, হাজারবার—তোর নয়তো কি আমার দোষ? আমার বাপ তো দূরের কথা, কেঁকালভাঙ্গা বুড়ো থুত্থুড়ে ঠাকুমা ঠাকুর্দ্দা পর্য্যন্ত মরবার নামগন্ধ করছে না। যাক্, বাঁশ কাটা হয়ে গেছে?

—না।

—কে সব ব্যবস্থা করছে?

সুরঞ্জনা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, যুবনাশ্বদার আর কে আছে বল যে করবে! তুমিই সব ব্যবস্থা কর হরিদা।

—Good News. আমিই সব ব্যবস্থা করছি। হরিদা সুরঞ্জনার দিকে একবার বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিশেষ ইঙ্গিতের সংকেত দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। মৃতদেহ শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাবার লোক পাওয়া এক বিরাট সমস্যা। হরিদাকে পাড়ার সকলে হয় ভয়ে নয় ভক্তিতে ভজে বলে প্রয়োজনীয় ব্রাহ্মণ কয়েকজন যোগাড় করতে দেরী হল না।

—নে ওঠ্ যুবনাশ্ব—যেতে হবে। হরিদা তাগাদা দিল। যুবনাশ্ব নির্বোধ দৃষ্টিতে হরিদার দিকে তাকালো।

—Good News! বলি, শ্মশানে যেতে হবে না? তুই না হলে মুখে আগুন দেবে কে? হরিদাকে চেপে ধরল যুবনাশ্ব।

—তোমরা আমার মাকে কিছুতেই পোড়াতে পারবে না—তোমরা আমার সব শত্রু।

—জ্যান্ত মাকে ধরে রাখবার মুরোদ হলনা, এখন আর মড়া নিয়ে র‍্যালা করিস না।

যুবনাশ্ব আস্তে আস্তে বলল, হ্যাঁ, হরিদা আমি যাবো। মা আমার যে মুখ দিয়ে আদর করে চুমো দিয়েছে সেই মুখে আগুন ধরিয়ে দেবো।

শ্মশান ঘাটে পৌঁছিতে দুপুর গড়িয়ে গেল। নিদারুণ দ্বিপ্রহরে ক্রন্দনময়ী গঙ্গার বুকে চিতা জ্বলে উঠল। মড়া পুড়িয়ে স্নান সেরে যুবনাশ্ব চুপ করে ঘাটে বসল।

—চল্ যুবনাশ্ব, বাড়ী যাওয়া যাক এবার।

—তোমরা সব বাড়ী যাও হরিদা—বাড়ীতে আমার জন্যে কেউ বসে নেই। আমি পরে যাবো।

—তা কি হয় নাকি? সবাইকে একসঙ্গে হরিধ্বনি দিয়ে ফিরতে হয় এই হচ্ছে বিধান।

—মৃত্যুর কোনো বিধান নেই হরিদা।

—Good News! কিন্তু এই শ্মশানের চত্বরে বসে একা একা তুই কি করবি যুবনাশ্ব?

—কিছু না শুধু ভাববো।

—Good News! বাড়ী গিয়ে ভাববি—এখন ওঠ্।

হরিদা যুবনাশ্বকে ঠেলা দিল।

বাড়ী ফিরে যুবনাশ্ব দেখল সুরঞ্জনাকে নিয়ে সুশীলা পিসি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুরঞ্জনা এগিয়ে এসে যুবনাশ্বকে একটা আনকোরা নতুন কাপড় দিয়ে বলল, ভিজে কাপড় ছেড়ে এই কাপড়টা পর যুবনাশ্ব।

যুবনাশ্ব কোনো কথা না বলে সুরঞ্জনার কথা মতো কাজ করল। সুরঞ্জনাই আবার বলল, আমাদের বাড়ীতে আজ রাত্রে তোমার খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যুবনাশ্ব—একা একা এখানে থাকতে হবে না, চল আমাদের বাড়ী।

—মিছামিছি ব্যস্ত হোয়োনা রঞ্জনা—আজ আর আমি কিছু খাবোনা।

—সারাদিন জলস্পর্শ করনি, এমন করে দেহমনের উপর অত্যাচার করলে তুমি আর কদিন বাঁচবে যুবনাশ্ব?

—ওমা খাবি না কেন বাছা? মা কি কারো চিরদিন থাকে?

—জানি পিসি, মা কারো চিরদিন থাকেনা—কিন্তু একজন কেউ নিশ্চয়ই থাকে—আমার মতো অভাগা, অসহায় বোধহয় রাস্তার ওই নেড়ী কুকুরটাও নয়।

—আমি বেঁচে থাকতে শান্তির ছেলে না খেয়ে লোকের দোরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরবে? কি যে সব বলিস্! আমার যা ক্ষুদকুঁড়ো জুটবে, তোরও তাই জুটবে। যা এখন সুরোর সঙ্গে ওদের বাড়ী যা, অবুঝ হস না।

যুবনাশ্ব আর অবুঝ হল না।

## ( আট )

কয়েকদিন পরের কথা। সকালবেলায় শেখরবাবুর চাকর রামদীন এসে জানাল যে তার বাবু যুবনাশ্বকে সেলাম জানিয়েছে। শেখরবাবু এই পাড়ার সবচেয়ে অবস্থাপন্ন লোক। নামকরা এম বি

ডাক্তার। রাসভারী, কড়ামেজাজী এবং চশমখোর বলে সমাজে তাঁর বেশ নামডাক আছে। দুটাকা ভিজিটের এক পয়সাও কম নেন না। কলে বার হবার আগেই তিনি জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন রোগীর ফিস্ দেবার সঙ্গতি আছে কিনা। এমন বাপের মেয়ে সুশোভনা!

শেখরবাবুর সঙ্গে যুবনাশ্বের সাক্ষাৎ পরিচয় নেহাৎই সামাজিক। শেখরবাবু কেন যে তাকে ডেকেছে এটা যুবনাশ্বের পক্ষে অনুমান করা বেশ কঠিন। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়ল।

শেখরবাবু বৈঠকখানা ঘরে বসে সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন। রোগীর আমদানী তখনো আরম্ভ হয়নি। যুবনাশ্ব ঘরে ঢুকে বলল, শেখরবাবু, আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

—কে যুবনাশ্ব? এসো বোসো!

যুবনাশ্ব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

—তোমার এতো বড় একটা mishap হয়ে গেছে তার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত যুবনাশ্ব। Anyway, কি করা যাবে বল। দুঃখ কষ্ট সবকিছু হাসিমুখে মেনে নেওয়াই পুরুষকার। যাক ও কথা, পড়াশুনা নিশ্চয়ই চালিয়ে যাবে তো?

—এখনো ওসব কথা চিন্তা করবার মতো মনের অবস্থা হয়নি।

—আর হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কিভাবে হচ্ছে? নিজেই রেঁধে খাচ্ছ?

—না, সুশীলা পিসিই রেঁধে দেন।

—Anyway, আমি বলিকি, তুমি পড়াশুনা চালিয়েই যাও—আর, আর আমার বাড়ীতে থেকেই পড়।

যুবনাশ্ব শেখরবাবুর বক্তব্যের তাৎপর্য্য বুঝতে পারল না।

—আপনার বাড়ীতে—মানে—

—মানে আবার কি? আমার বাড়ীতে থাকবে আর খাবে।

—কিন্তু—

শেখরবাবু যুবনাশ্বের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, কিন্তু কি বল ?

—আপনি নিঃস্বার্থভাবে আমায় থাকতে দেবেন কেন আর আমিই বা থাকব কেন ?

—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ যুবনাশ্ব। কে তোমায় বললে যে আমি তোমায় নিঃস্বার্থভাবে থাকতে দিচ্ছি ?

—আমি ভেবেছিলাম—যুবনাশ্ব আম্‌তা আম্‌তা করে বলল !

—তোমার ভাবাটাই তো অন্যায়। আমার স্বার্থ আছে বৈকি। সুশোভনাকে আমি মেডিক্যাল পড়াতে চাই—তাই আই. এস. সিতে ওর একটা ভালো রেজাল্ট হওয়া দরকার—বিশেষ করে অংকে ও বেশ weak. তোমার মতো ভালছেলের কাছ থেকে ওর একটা 'কোচ' দরকার। তাছাড়া—

তাছাড়া আর কি নিগূঢ় স্বার্থ আছে সেটাও বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন, সহসা নিজেকে সংবরণ করে ফেললেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, তাছাড়া, এখানে তোমার পড়াশুনার কোনো অসুবিধাই হবে না।

ম্লান হেসে যুবনাশ্ব বলল, বুঝেছি, আপনি আমায় করুণা করতে চান শেখরবাবু—জানি আপনার অনেক টাকা আছে কিন্তু আমি কাঙাল নই। যুবনাশ্ব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—একটু দাঁড়াও যুবনাশ্বদা—

দরজার পিছন থেকে সুশোভনা বেরিয়ে এলো। যুবনাশ্ব লক্ষ্য করেনি সুশোভনা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুশোভনার ডাক শুনে বিস্মিত হয়ে যুবনাশ্ব ফিরে দাঁড়াল।

—যার কেউ :নেই, কিছু নেই, তার মানঅভিমান সাজে না যুবনাশ্বদা। অক্ষমের বিক্ষোভ নিজেকেই শুধু উপহাস্যাস্পদ করে তোলে। কথা হচ্ছে, বাবা তোমাকে সত্যই দয়া দেখাচ্ছে না,

আমিই বাবার কাছে এ প্রস্তাব করেছিলাম। আমার ম্যাথ্‌মেটিক্‌সে সত্যই সাহায্য দরকার, তা না হলে বোধহয় পাস করতে পারব না।

—পয়সা ছড়ালে মাষ্টারের অভাব হয় না।

যুবনাশ্ব আর দাঁড়াল না।

—যুবনাশ্বদা, একটু দাঁড়াও। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এসে সুশোভনা যুবনাশ্বকে ধরে ফেলল।

যুবনাশ্ব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—তুমি আবার ছুটতে ছুটতে এলে কেন সুশোভনা?

—আমি জানিয়ে দিতে এলাম আমার বাবাকে অপমান করবার কোন অধিকার তোমার নেই—এর প্রতিশোধ আমি নেবো। সুশোভনা যেন একটা তীব্র উত্তেজনার অঙ্গারে পুড়ছে।

—কি যা তা বলছ তুমি সুশোভনা? কোথায় আমি তোমার বাবাকে অপমান করলাম?

—অপমান ছাড়া আর কি? আমি জানতাম না তুমি এতো ভীতু—ভীরু—কাপুরুষ—

—আমি ভীতু—ভীরু—কাপুরুষ?

—হ্যাঁ, তুমি—তুমি সুরঞ্জনাকে ভয় কর।

—তুমি কি বলছ সুশোভনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে তুমি ঠিকই পেরেছ। সুরঞ্জনা রাগ করবে বলেই তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকতে চাও না।

হেসে ফেলল যুবনাশ্ব। সুশোভনার কাছে সরে এসে কণ্ঠে শান্তস্নিগ্ধতার বিস্তার এনে বলল, তোমার এ অভিযোগ ভিত্তিহীন, সন্দেহ অমূলক সুশোভনা।

—তুমি অতো অহংকারী কেন যুবনাশ্বদা? কেউ যদি তোমার সাহায্য নিয়ে জীবনে বড় হয়ে চায় তুমি তাকে করুণা করবে না?

যুবনাশ্ব জবাব দিতে পারল না।

—যুবনাশ্বদা ? আর্দ্রগলায় কান্নার মতো ক'রে ডাকল সুশোভনা।

—বল সুশোভনা।

—আমাকে তুমি পড়াবেনা যুবনাশ্বদা ? যুবনাশ্বের খুব কাছে সরে এসে ভয়ংকর সুন্দর মোহিনী নারীর মোহময়তার মদির কটাক্ষ হেনে সুশোভনা বলল, আমি কি এতই ঘৃণ্য ?

—যুবনাশ্বের পৌরুষ আহত হল।

—ছিঃ সুশোভনা, নিজেকে ওইভাবে অপমান করতে নেই। শুধু তোমার ভুল ধারণা ভাঙ্গাবার জন্যেই আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী হলাম।

—তবু ভালো যে তুমি শুধু অপমান করেই চলে গেলে না যুবনাশ্বদা—তোমাব অশৌচ শেষ হয়ে গেলেই আমাদের বাড়ীতে আসছ তা'হলে।

—আসব সুশোভনা।

বাড়ী ফিরে যুবনাশ্ব তার নতুন বন্দোবস্তের কথা সকলের কাছে ঘোষণা করে দিয়েছিল। আর সবার মতো সুরঞ্জনাও জেনেছিল। সেদিন দুপুর বেলা খাওয়াদাওয়া সেরে যুবনাশ্ব বইপত্তর সব গুছিয়ে নিচ্ছিল। সুরঞ্জনা দরজার পাশে এসে উঁকি দিল।

—বাঁধাছাঁদার এতো সব ঘটা কেন ? ব্যাপারখানা কি ? তীর্থ-যাত্রায় বার হবে না কি ?

—এসো রঞ্জনা। তীর্থযাত্রাই বটে। উঠো মুসাফির, বাঁধ গাঁঠরিয়া বলে পৃথিবীর এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে খেয়া দিতে যাচ্ছি। সুশোভনাদের বাড়ীতেই আপাততঃ আস্তানা করছি।

—মানে ? সুরঞ্জনা ভ্রূকুঞ্চিত করল। যেন সে কিছুই জানে না।

—মানে অতি সরল। আমাকে অসহায় দেখে ভদ্রলোক

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন আর এই মাতৃপিতৃহীন অনাথ ছেলেটির প্রতি অসীম করুণাপরবশ হয়ে আশ্রয় দিতে চান।

মুখ ভেংচে সুরঞ্জনা বলল, আর ওদের দয়াদাক্ষিণ্য পেয়ে তুমি একেবারে গলে জল হয়ে গেছ, কি বল? ইডিয়েট আর বলে কাকে!

—আঃ, গালাগাল দেবার আগে আমার কথাটাই শোনো না ছাই।

—না, আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না—তোমার ওখানে যাওয়া হবে না।

যুবনাশ্ব হতাশভাবে বই পত্তরগুলো রেখে সুরঞ্জনার পাশে এসে দাঁড়ল।

—এই লক্ষ্মীটি শোনো! সব না জেনেশুনে অবুঝের মতো শুধুই রাগারাগি করছ।

—শোনবার আছেটা কি? সুরঞ্জনা কোমরে হাত দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গী করে দাঁড়াল।

—অনেক কিছু আছে। আর সব কিছু তোমায় শুনতেই হবে। এই বোসো। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার হাত ধরে টান দিল। যুবনাশ্ব তার বক্তব্য তাকে না শুনিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। অগত্যা সুরঞ্জনাকে বসতে হল।

—বলছি যে আমি ওদের কাছ থেকে মোটেই ভিক্ষা নিচ্ছি না। কথা হয়েছে যে আমি সুশোভনাকে পড়াবো আর তার পরিবর্তে শেখরবাবু আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবেন। তুমি বুঝি ভাবছ বিনা প্রতিদানে আমি ওদের দয়া গ্রহণ করছি?

—না, সুশোভনাকে তুমি কিছুতেই পড়াতে পারবে না।

—এই দেখো, আবার ছেলেমানুষী করে। তুমি reasonable হবে এটাই আমি আশা করছি সুরঞ্জনা।

—না, ওসব হবে না।

—আরে শোনো বলি! আমি চিরজীবন ওদের বাড়ী থাকতে যাচ্ছি বুঝি? পরীক্ষা হয়ে গেলেই একটা চাকরী বাকরী না হয় একটা স্কুলমাষ্টারী জুটিয়ে নিয়ে আবার নিজের বাড়ীতে এসে উঠব—এবার আর কিন্তু একা একা নয়—গৃহলক্ষ্মীকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করে গৃহস্থালী পাতব। যুবনাশ্ব আদর করে সুরঞ্জনার বিশাল খোঁপাটি খুলে দিল।

—না, ওদের বাড়ীতে তোমায় আমি কিছুতেই থাকতে দেবো না। সুশোভনার বাবার কি ইচ্ছে আমি বুঝতে পারি না ভাবো? আমায় তুমি ন্যাকা পেয়েছ? উনি চান তোমার সঙ্গে সুশোভনার বিয়ে দিয়ে তোমায় ঘরজামাই করে রাখতে। সুশোভনার গায়েপড়া স্বভাব আমার আর জানতে বাকি নেই।

যুবনাশ্ব হো হো করে হেসে ব্যাপারটা হাল্কা করতে চাইল।

—কি পাগলের মতো বকছ রঞ্জনা। তোমার সম্পত্তির উপর বিশ্বশুদ্ধ লোক লোভ করে বসে আছে. এ দুশ্চিন্তা কেন? ভয় নেই, তোমার সম্পত্তি খোয়া যাবে না।

—ভরষাও নেই।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না রঞ্জনা?

—তোমাকে করি কিন্তু পুরুষকে নয়। তাছাড়া মন না মতি—চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হতে কতক্ষণ?

—তুমি যে এতখানি সংকীর্ণমনা হতে পার এ আমি ভাবতেই পারি না রঞ্জনা। তোমার বিনা অনুমতিতে আমি কিছুই করব না—বেশ তো তুমি যা চাও তাই হবে।

সহসা সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের উপর ভেঙ্গে পড়ল।

—সত্যই যুবনাশ্ব, আমি সংকীর্ণমনা—আমি শুধু তোমায় আগল দিয়ে আকড়ে রাখতে চাই। তুমি জানো না যুবনাশ্ব—তুমি জানো না—

সুরঞ্জনা আর কিছু বলতে পারে না। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার মুখখানি সস্নেহে তুলে বলল, জানি রঞ্জনা—জানি

তুমি আমায় কতো গভীরভাবে ভালবাসো। কিন্তু রঞ্জনা ভালবাসা তো মানুষকে শুচিশুভ্র উদার করে—

—তুমি যাও যুবনাশ্ব—আমি তোমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না। কিন্তু—

—বল রঞ্জনা ?

—জানো যুবনাশ্ব আমার কেবলি মনে হচ্ছে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে একটি বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্র চলছে।

—দূর, বোকা মেয়ে কোথাকার ! যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার চুলগুলো নেড়ে দিল।

—তুমি আমায় ভুলবেনা তো যুবনাশ্ব ?

—ইস্, ভুললেই হল ? প্রাণভোলাবার মতো মেয়ে শ্রীমতী সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য্য ছাড়া বিশ্বজগতে তো আর একটিও দেখলাম না।

## ( নয় )

সন্ধ্যাবেলা যুবনাশ্ব সুশোভনাকে পড়াতে বসল। অংক করবার পদ্ধতি বুঝিয়ে সে সুশোভনাকে কতকগুলো অংক দিল। সুশোভনা অতি দ্রুত অংকগুলো নির্ভুলভাবে করে দিয়ে যুবনাশ্বকে তাক লাগিয়ে দিল।

প্রশংসমান দৃষ্টি ফেলে যুবনাশ্ব বলল, তবে যে শুনলাম তুমি অংকে weak ! তুমি এতো বুদ্ধিমতী এ আমার জানা ছিল না সুশোভনা।

প্রশংসা শুনে লজ্জা পেয়ে সুশোভনা বলল, আমার আবার বুদ্ধি আছে না ছাই ! এ অতি সোজা অংক তাই হল। অংক করতে

আর আমার ভালো লাগছে না—আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো, যুবনাশ্বদা ?

—তোমার মনের কথা আমি কেমন করে জানব বল, আমি তো আর অন্তর্যামী নই।

চোখেমুখে একটা অলৌকিক মোহময়তার কৃত্রিমতা এনে সুশোভনা বলল, আশ্চর্য্য।

যুবনাশ্ব বুঝতে পারল না আশ্চর্য্য তার কোন্‌খানটা। নীরবে নত মুখে আড়চোখে একেবার নিজের শরীরটা পর্য্যবেক্ষণ করে নিল।

—আমার গান গাইতে ভারী ইচ্ছে হচ্ছে। হাসির উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠল সুশোভনা।

—বেশতো গানই হোক। তবে আগে থেকেই জানিয়ে দিই আমি সুর নই—অসুর। তোমার গানের সম্যক্‌ মূল্যায়ন বোধহয় আমি করতে পারব না।

সুশোভনা ক্ষুন্ন হল।

—থাক্‌ আর গান গেয়ে দরকার নেই।

—অমনি অভিমান! গাও সুশোভনা, লক্ষ্মীটি। যুবনাশ্বের কণ্ঠে শুধু অনুরোধ নয়, অনুনয়ও ফুটে উঠল।

সুশোভনা এই অনুরোধ উপরোধই কামনা করছিল। হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে সে রবীন্দ্র সংগীত আরম্ভ করল, এমন দিনেই তারে বলা যায়··· । ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনীর আলাপ আর সুরের মীড় গমক মূর্চ্ছনায় ঈথার তরঙ্গ কেঁপে উঠল। সুরের ঝংকারে ঝংকারে স্বপ্নরোমাঞ্চিত মুসাফির মন রূপ লোকের ইন্দ্রধনু উপকূলে ভেসে গেল। গান শেষ হলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো যুবনাশ্ব বলল, তুমি যে এতো ভাল গান গাও, তুমি যে এতো গুণের আধার এ আমার জানা ছিল না সুশোভনা। অপ্রাসঙ্গিকভাবে সহসা সুশোভনা বলল, আমায় তোমার ভালো লাগে না যুবনাশ্বদা ?

দরদী গলায় যুবনাশ্ব বলল, তোমার শিল্পীমনকে ভাল না বেসে

কেউ থাকতে পারে? তোমার মতো accomplished মেয়েকে ভালো লাগাটাই তো স্বাভাবিক সুশোভনা। যুবনাশ্ব সুশোভনার সহজ প্রশ্ন এগিয়ে যেতে চাইল।

—সুরঞ্জনার মতো নিশ্চয়ই কাউকে ভাল লাগে না। তির্য্যক হল সুশোভনা।

যুবনাশ্ব মনে মনে ভীত হল।

—হঠাৎ রঞ্জনার কথা উঠল কেন সুশোভনা?

কণ্ঠস্বরে উদাসীন নৈর্ব্যক্তিকতা টেনে এনে সুশোভনা বলল, এমনি!

যুবনাশ্ব সুশোভনার প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে গেল। নাশোনার ভান করে বলল, আচ্ছা, সুশোভনা তুমি আর রঞ্জনা কেউ কারো সঙ্গে কথা বল না—তোমাদের দুজনার মধ্যে একটুও বনিবনা নেই কেন বলত?

—সুরঞ্জনা আমার সঙ্গে কথা বলে না তাই আমিও তার সঙ্গে কথা বলি না।

—রঞ্জনা যদি তোমার সঙ্গে কথা বলে তাহলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে তো?

—হুঁ, কেন বলবনা শুনি? সুরঞ্জনার মতো আমার মনটা অতো নীচু নয় জানবেন।

—কিসে তোমার ধারণা হল ওর মনটা নীচু?

—অনেক কারণেই। তোমার সঙ্গে কোনো মেয়ে হেসে কথা বললে দেখবে সুরঞ্জনার ভাবখানা—চোখ দিয়ে যেন গিলে খেতে চায়—বাগে পেলে নেকড়ের মতো নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে।

যুবনাশ্ব হেসে বলল, অপরের অনুপস্থিতিতে পরচর্চা সাধারণতঃ পরনিন্দায় পর্যবসিত হয়। যাক্‌, এবার আমি উঠি সুশোভনা—আমার নিজের বইপত্তরগুলো একটু ঘাঁটতে হবে এইবার।

—বেশ, কাল কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ছাড়বনা—অনেকক্ষণ

ধরে পড়াতে হবে। সুশোভনার চোখেমুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

যুবনাশ্ব শুধু একটু হাসল।

কার্য্যতঃ সুশোভনাকে যুবনাশ্ব খুব বেশীক্ষণ পড়াতে পারে না। কলেজ থেকে ফিরে সুরঞ্জনাদের বাড়ী যায়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে বাড়ী ফেরে। যেদিন সুরঞ্জনার আগে ক্লাশ শেষ হয় সেদিন সে যুবনাশ্বের জন্য অপেক্ষা করে আর তা না হলে যুবনাশ্বই সুরঞ্জনার জন্যে প্রতীক্ষা করে। তারপর দেড় মাইল রাস্তা উচ্ছল হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে দুজনে বাড়ী ফেরে।

—তুমি বাড়ী যাবে না সুরঞ্জনা? ক্লাশ শেষ করে মেয়ের দল এগিয়ে যেতে যেতে সুরঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করল।

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে সুরঞ্জনা শুধু একটু নীরব হাসল যার অর্থ তোমরা যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি। অপর একটি মেয়ে টিপ্পনি কাটল, she is waiting for her fiance' আমরা আর কার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব বাবা? আমরা চলি।

অনুসন্ধিৎসু একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ছেলেটিরে?

—ফোর্থ ইয়ারে সায়ান্স পড়ে—যুবনাশ্ব লাহিড়ী– এই কলেজের স্কলার খুব টল ফিগার। বিশদ করে বলল অপর একটি মেয়ে।

—ওরা ভাইবোনও তো হতে পারে। কলেজের গেট পার হতে হতে একটি আনাড়ী মেয়ে বেকুবের মতো মন্তব্য করল।

—একজন হল লাহিড়ী আর একজন ভটচাজ—আপন ভাইবোন হয় কি করে শুনি?

—তা' যেন হল। কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে সুরঞ্জনা যুবনাশ্বকে ভালবাসে? এক পাড়ায় থাকে সাধারণ বন্ধুত্বও হতে পারে তো?

—Experiment করে ছিলাম। গম্ভীরমুখে জবাব দিল প্রতিভা।

—কি রকম? মেয়ের দল সবাই উদ্‌গ্রীব হল।

প্রতিভা চলতে চলতে রহস্যভেদী বিশ্লেষণ করল: মাসখানেক আগের কথা। যুবনাশ্ব সেদিন কলেজে আসিনি। মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি গজালো। সুরঞ্জনাকে নিয়ে একটু মজা করা যাক। সেকেণ্ড পিরিয়ড হয়ে যাবার পর সুরঞ্জনাকে কমনরুমে ডেকে বললাম, সুরঞ্জনা, তুমি আজ কলেজে এলে যে বড় ?

অবাক হয়ে সুরঞ্জনা বলল, কলেজে আসব না কেন? তুমি আমায় নন-কলিজিয়েট হতে বল বুঝি? বললাম, তোমার যুবনাশ্বদা আসেনি।

সুরঞ্জনা কণ্ঠে বিরক্তি এনে বলল, কে এসেছে না এসেছে তাতে আমার কি? বললাম, আমার কি মানে? কলেজে আসবার সময় যুবনাশ্বের সাইকেলের সঙ্গে একটা লরীর ধাক্কা হয়েছে—যুবনাশ্বের মাথা কেটে দু'খানা হয়ে গেছে। সে ইমামবাড়া হাসপাতালে রয়েছে—এখনো জ্ঞান ফিরিনি—কি হবে বলা যায় না। তখন সুরঞ্জনা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। সবার সামনে ছোট ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হাত থেকে বই খাতা খসে পড়ে গেল। একেবারে পাগলের মতো অবস্থা তার। হাসপাতালে ছুটে যায় আর কি! আমি ধরে ফেলে প্রবোধ দিয়ে বললাম, দূর, ওসব মিথ্যে, তোমায় নিয়ে একটু মজা করছিলাম। বুঝতেই পারো নিগূঢ় কার্যকারণ সম্বন্ধ না থাকলে একজনের বিপদের কথায় অন্যজন অতো উতলা হবে কেন? অন্য মেয়েরা সব ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

যাকে কেন্দ্র করে মেয়ের দল এতো জল্পনা কল্পনা করে রাস্তা সরগরম করে চলছিল সেই সুরঞ্জনা তখন কমনরুমে বসে একটি বহুব্যবহৃত ম্যাগাজিনের পাতা উলটাচ্ছিল অর্থাৎ সে যুবনাশ্বের জন্যে অপেক্ষা করছিল। কেমিষ্ট্রীর প্রাকটিক্যাল ক্লাশ শেষ হতেই যুবনাশ্ব অধীর আগ্রহে মেয়েদের কমনরুমের সামনে এসে দাঁড়ালো।

মেয়েদের কমনরুমের ভিতর ঢোকা অশালীন। ঢোকবার প্রয়োজনও হলনা। ফোর্থ ইয়ারের ঋতা শীল কমনরুম থেকে সেই সময় বার হচ্ছিল। সুরঞ্জনার প্রতি যুবনাশ্বের দুর্বলতা আর সবার মতো তারও অজানা নেই। মেঘদূতের কাজটা সে-ই সম্পন্ন করে দিল।

—সুরঞ্জনা, যুবনাশ্ব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সুরঞ্জনা তাড়াতাড়ি কমনরুম থেকে বেরিয়ে এলো। দুজনের চোখে টেলিগ্রাফ হয়ে গেল। সুরঞ্জনাকে অনুসরণ করে যুবনাশ্ব চলতে আরম্ভ করল।

—এই রঞ্জনা, আস্তে চল। অতো জোরে চললে কুড়ি মিনিটের আগেই বাড়ী পোঁছে যাবো।

সুরঞ্জনা কথা না বলে চলার গতি হ্রাস করে দিল।

—এই, কথা বলছ না যে বড়? এই নাও চকোলেট খাও।

সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের হাত থেকে চকোলেট নিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলব না।

—বুঝিছি কাল যেতে পারিনি বলে শ্রীমতী সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য্যের অভিমান হয়েছে। কিন্তু কেন যেতে পারিনি তার কারণ জানালে তোমার সব রাগ জল হয়ে যাবে।

—কারণ আমার খুব জানা আছে—সুশোভনাকে পড়াতে গিয়ে সব ভুলে গিয়েছিলে তো? মায়ের আদরে মাথা খাওয়া অবোধ বালিকার অবাধ্যতা ফুটে উঠল সুরঞ্জনার কণ্ঠস্বরে।

—আরে শোনই আগে! যুবনাশ্ব বিপন্ন বোধ করল।

—শুনব আবার কি? আমার আর জানতে বাকা নেই যে আজকাল সুশোভনার পড়াশুনো সম্বন্ধে তোমার interest খুব বেশী। আর পড়াশুনা নিশ্চয়ই text books এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে হৃদয়াংশটুকু যোগ করে দিয়ে অনেক দুর এগিয়ে যাওয়া হয়। সুরঞ্জনা রাগে লাল হয়ে উঠল।

—তোমায় নিয়ে তো মহাবিপদে পড়া গেল দেখছি। মেয়েরা একবার জেলাস হলে কেলেঙ্কারীর একশেষ না করে ছাড়ে না।

যুবনাশ্ব আড়চোখে সুরঞ্জনার দিকে তাকালো কিন্তু সুরঞ্জনা নরম হয়েছে বলে মনে হল না। তাই সুরঞ্জনায় মান ভঞ্জন করবার জন্যে যুবনাশ্ব হরিদার কাছ থেকে শোনা চুটকী ঝাড়ল। সুরঞ্জনা আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে খিলখিল :করে হেসে উঠল। তার শক্ত মন সিক্ত হল। তপ্ত প্রাণ তৃপ্ত হল। যুবনাশ্ব সাহস পেয়ে বলল, তুমি বোধ হয় শুনেছ রঞ্জনা যে নিখিলবঙ্গ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সেকেণ্ড হয়ে আমি একশো টাকা প্রাইজ পেয়েছি।

—বেশ করেছ। সুরঞ্জনা নিরাসক্ত গলায় বলল।

—এযে একেবারে নৈব্যক্তিক মন্তব্য। আমার কৃতিত্বে তোমার আনন্দ হয় না রঞ্জনা?

সুরঞ্জনা কোনো উত্তর দিল না।

যুবনাশ্ব ম্লান হেসে বলল, জানো রঞ্জনা, আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকত এই সংবাদ শুনে কতো না আনন্দ পেতো। এই বিশাল পৃথিবীতে আজ আর আমার কেউ নেই। ভাবতাম কেউ না থাক আমার রঞ্জনা তো আছে।

সুরঞ্জনার সেন্টিমেন্টে জ্বালা করে উঠল। চোখের জল গোপন করবার জন্যে সে মুখ ফেরালো। কেমন করে সুরঞ্জনা জানাবে সে যুবনাশ্বকে কতো ভালবাসে? রামভক্তের মতো বুক চিরে সে কি মর্মমূল থেকে রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে দেখাবে সেখানে শুধু তারই নাম অগ্নিআখরে লেখা আছে?

—রঞ্জনা—যুবনাশ্বের ব্যথা কান্না হয়ে ঝরে পড়ল।

—কিছু বলবে? সুরঞ্জনার প্রেমস্নিগ্ধ তরল কণ্ঠে পীযুষ পেয়ালা উপচে পড়ল।

—আজ তোমাদের বাড়ী যাবো তো?

—মনে নেই, আজ আমাদের বাড়ীতে তোমার না নেমন্তন্ন ?

—ইস, ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলে—এখুনি একটি খাওয়া মিস্ করে ছিলাম আর কি !

হেসে ফেলল সুরঞ্জনা।

—আমাদের বাড়ী এসে গেছে রঞ্জনা—তুমি যাও, বইগুলো রেখেই আমি আসছি। যুবনাশ্ব সাইকেলে উঠে পড়ল।

—এক্ষুণি আসা চাই কিন্তু।

যুবনাশ্ব কটাক্ষ করে শুধু একটু মধুর হাসল।

সেদিন বিকালে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাদের বাড়ী যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় সুশোভনা ডাক দিল যুবনাশ্বদা, শোনো—

যুবনাশ্ব দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আজ সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবো—তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

—চেষ্টা করব। যুবনাশ্ব আর দাঁড়ালোনা।

সুরঞ্জনাদের বাড়ী থেকে যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি ফিরতে পারল না। যখন ফিরল তখন সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখল সুশোভনা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যুবনাশ্ব সুশোভনার কাছে এসে কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলল, একটু জরুরী প্রয়োজন থাকায় দেরী হয়ে গেল সুশোভনা—তুমি কিছু মনে করনা।

সুশোভনা মুখ না ফিরিয়েই বলল, ভুলে যেয়োনা যুবনাশ্বদা তুমি আমদের আশ্রিত।

যুবনাশ্ব সুশোভনার খুব কাছে সরে এসে মুখটা কঠিন করে কঠোর কণ্ঠে বলল, সেটা স্মরণ করিয়ে দেবার মতো অকৃতজ্ঞতা নিশ্চয়ই এখনো আমার দিক থেকে প্রকাশ পাইনি।

—দেখো যুবনাশ্বদা অর্থনৈতিক সম্পর্কের কোনো কথা তুলে

তোমার কর্ত্তব্যবোধ জাগাতে চাই না—আমি সাধারণ ভদ্রতাটুকুই তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।

—আমি তোমায় পড়াতে সাহায্য করব এ কথাই ছিল। তোমার বডিগার্ড হয়ে সারা শহর পরিভ্রমণ করব এমন দস্তখৎ নিশ্চয়ই তমসুকে লেখা নেই। যাক ওকথা। পড়বে চল সুশোভনা!

সুশোভনা রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বলল, না। তারপরই দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

বিকালবেলা কলেজ থেকে ফিরে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাকে পড়াতে যায়। পড়া শেষ হলে সুরঞ্জনার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা আর গল্প গুজব হয় কিছুক্ষণ। তারপর যুবনাশ্ব ফিরে এসে সুশোভনাকে পড়াতে বসে। কিন্তু গত কালকার ব্যাপারের পর থেকে স্বাভাবিকতার সহজ সুর কেটে গেছে। সুরঞ্জনা রাগে জ্বলছে। আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া! অসহ্য! অসহ্য এ ঔদ্ধত্য! সুশোভনা মর্মে মর্মে জানে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাকে ভালোবাসে, তবুও স্মৃতির সুরভি মাখিয়ে প্রাণের গহনে এতোদিন সে এক গোপন ঈপ্সাকে লালন করে এসেছে। মনে মনে সত্যান্বেষী সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সে নিজেকে সুরঞ্জনার সঙ্গে তুলনা করে দেখেছে। সুরঞ্জনার চাইতে সুশোভনা অনেক বেশী সুন্দরী। কলেজের ছেলেরা তার অসাক্ষাতে নেপথ্যনায়িকাকে মিস্ চিনসুরা' বলে থাকে। একথা সুশোভনার কানে গেছে এবং শুনে সে গর্ববোধ করেছে। তাছাড়া তার বাবার গাড়ী বাড়ী আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স যে কোন ছেলের মাথা তার দিকে ঘুরিয়ে দেবে। সুরঞ্জনার কি আছে? বুদ্ধিমত্তা এবং লেখাপড়ায় সুরঞ্জনার চাইতে সে অনেক উঁচুতে। কিছুদিন এক বাড়ীতে একছাদের নীচে বসবাস করলে যুবনাশ্ব নিশ্চয়ই তারপ্রতি আকৃষ্ট হবে এমনই একটা বদ্ধমূল ধারণা সুশোভনার মর্ম্মমূলে ছিল। কিন্তু গত কালকার ব্যাপারের পর

সুশোভনা সত্যই বুঝেছে যুদ্ধ জয়ের কোনো আশাই আর অবশিষ্ট নাই। যুবনাশ্ব কোনোদিনই তার দিকে দিক্‌পাত করবে না। যদি যুবনাশ্বকে পাওয়া তার পক্ষে দুরূহ হয় তবে আর কেন শুধু শুধু বঞ্চনার শূন্যতায় সুশোভনা তার পিছুপিছু ছোটে? শুধু পড়াশুনোয় সাহায্য করবার জন্যে যুবনাশ্বকে রাখা হয় নি। ওটা একটি অজুহাত মাত্র। পড়াশুনো দেখিয়ে দেবার জন্যে অনেক ছোকরা অধ্যাপক মিলবে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

সন্ধ্যাবেলা সুবঞ্জনার কাছ থেকে ফিরে যুবনাশ্ব সুশোভনাকে পড়াতে গিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। ঘরশূন্য। বাহিরের দিকে তাকাতেই চোখ পড়ল বারান্দার রেলিং ধরে উদাস নেত্রে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে সুশোভনা।

—একা একা তুমি কি ভাবছ সুশোভনা? পড়তে বসবে না?

সুশোভনা চুপ করে আগের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েই রইল। কোনো উত্তর দিল না।

—চল সুশোভনা, পড়তে হবে না? তোমার পরীক্ষার আর দেরী নেই? অনুনয় করল যুবনাশ্ব।

—তোমার কাছে পড়তে আমার ভালো লাগে না। সুশোভনা মুখ না ফিরিয়েই নির্বিকারভাবে জবাব দিল। তার মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হল না।

অপ্রত্যাশিত আঘাতের আত্যন্তিকতায় যুবনাশ্ব স্তব্ধ হয়ে গেল। তার ধারণা ছিল না যে কেউ এমনভাবে মুখের উপর রূঢ় জবাব দিতে পারে। এক মুহূর্তে যুবনাশ্ব নিজেকে কঠিন করে নিয়ে বলল, উত্তম কথা। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গত কালই বিকেলবেলায় শ্রীমতী সুশোভনা দেবী এই অধমের সাহচর্য্য লালসায় অধীর হয়েছিলেন?

—Shut up মুখ সামলে, ওজন করে কথা বলবে যুবনাশ্বদা— Don't forget that the relation between you and me is that one of master and servant.

—এক মুহূর্তের জন্যেও আমি সেকথা ভুলিনি সুশোভনা। ভুলিনি যে তোমাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় না পেলে হয়ত কলেজ ছেড়ে আজ আমায় কুকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হত।

—দেখো যুবনাশ্বদা, চোরাবালির উপর মিথ্যে মিথ্যে একটি সম্বন্ধের ভিত্তিহীন ইমারৎ গড়ে তোলবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমিও সব বোঝো, আমিও বুঝি। You know it better than I do why father has given you shelter. কিন্তু বাবার সে ইচ্ছা কোনো দিনই পূর্ণ হবে না কারণ তুমি সুরঞ্জনার সঙ্গে প্রেম কর। এখন যেটা তোমার পক্ষে আশু করণীয় এবং তোমার আমার উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর সেটা হচ্ছে তুমি যত শীঘ্র পার এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও।

এতো বড় রূঢ় প্রত্যাখ্যানের জন্য যুবনাশ্ব প্রস্তুত ছিল না। তাল সামলাতে রেলিংটা ধরে ফেলল।

—কিন্তু সুশোভনা আর কিছুদিন পরে তোমার পরীক্ষা···তারপর বাধা দিয়ে সুশোভনা বলল আমার পরীক্ষা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই। নারী সুলভ বিকৃত প্রতিহিংসায় সুশোভনা হিংস্র হয়ে উঠেছে।

—বেশ ভালো কথা। আমি—আমি কালই চলে যাবো সুশোভনা কিন্তু—

—আর কোনো কিন্তু নয়—শেষ উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি। আঁচলটা টেনে নিয়ে সুশোভনা দ্রুত চলে গেল।

পরদিন সকাল বেলায়ই যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাদের বাড়ী এসে হাজির হল। এমন সময় যুবনাশ্বকে দেখে সুরঞ্জনা অবাক হয়ে গেল।

—একি, এতো সকালে? এসো এসো—

যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার বিছানার উপর বসে পড়ে বলল, ওরা আর আমায় থাকতে দেবে না রঞ্জনা।

—ওরা কারা? কাদের কথা বলছ তুমি?

—শেখরবাবুর কথা বলছি।

—হুঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। কিন্তু তোমার অপরাধ?

—আমার অপরাধ আমি তোমায় ভালবাসি রঞ্জনা।

—ভালই হয়েছে। সুশীলা পিসিকে ঘরদোর খুলে দিতে বলব?

—না, এখানে আর থাকবনা রঞ্জনা। জীবিকার সন্ধানে মহানগরীর বুকে পাড়ি দেবো।

—কোলকাতায় কোথায় গিয়ে উঠবে!

—ওই বিরাট মহানগরীতে মাথা গোঁজবার মতো এতটুকু ঠাঁই আমি নিশ্চয়ই করে নিতে পারব, রঞ্জনা! কলকাতায় আপাততঃ কাকার বাসায় গিয়েই উঠব। খুব বেশী দিন তাঁদের জ্বালাবার ইচ্ছা নেই। একটা কাজটাজ কিছু জুটিয়ে নিতে পারলেই—একটি মেসে আস্তানা গাড়ব।

—তোমায় না দেখে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব যুবনাশ্ব?

—যেমন করে আমি থাকব রঞ্জনা।

—না, না আমি কিছুতেই তা পারব না। সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের বুক ভেঙ্গে পড়ল।

—এই—ছিঃ, পাগলামো করে না। দুর্য্যোগসংক্ষুব্ধ রাত্রির গহীন আঁধারে বিভ্রান্ত পথিক পথ খুঁজে নেবার প্রেরণা তার মমতাময়ী প্রিয়তমার কাছেই তো পাবে। তুমি এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লে আমি যে সাহস হারিয়ে ফেলব রঞ্জনা। তোমার চোখের জলে আমার যাত্রাপথ পিছল করে দিও না। যে প্রেম সম্মুখপানে চলতে চালাতে না জানে, সে তো সত্যকারের প্রেম নয় রঞ্জনা।

সুরঞ্জনা সংযত হয়ে নিজেকে যুবনাশ্বের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বলল, তাইহোক যুবনাশ্ব। যাবার বেলায় পিছু ডেকে তোমায় রাস্তায় হোঁচট খাওয়াতে চাই না। কথা দাও, সপ্তায় অন্ততঃ একখানা করে পত্র তুমি আমায় দেবে।

—তোমার কথায় কথা দিচ্ছি রঞ্জনা।

—আজই যাবে যুবনাশ্ব?

—এখনই।

—ধূলো পায়ে চলে যাবে সে হবেনা। তুমি বোসো, আমি দেখছি কি আছে।

সুরঞ্জনা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে সুরঞ্জনার মা খানকয়েক পরোটা নিয়ে এলেন। সুরঞ্জনা সংক্ষেপে মাকে জানিয়েছে যে সুশোভনাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় যুবনাশ্ব কোলকাতায় কাকার বাড়ী যাচ্ছে। সুরঞ্জনার মা যুবনাশ্বকে খেতে দিয়ে সামনে এসে বসলেন। অদূরে দরজার চৌকাঠ ধরে মলিনমুখে বিষণ্ণ দৃষ্টিনিয়ে দাঁড়ালো সুরঞ্জনা।

—দেখো বাবা, যুবনাশ্ব, একটি কথা অনেকদিন থেকেই বলব বলব ভাবছি—সুরোর পরীক্ষা হয়ে গেলেই ওর বিয়ে দিয়ে দেবো—কুলীন গেরোস্তর মেয়েকে আব আইবুড়ো করে ঘরে রাখা যায় না—পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে। আমি বাবা মনে মনে পাত্তরও ঠিক করে রেখেছি।

আনন্দ এবং উত্তেজনায় যুবনাশ্বের বুক দুরুদুরু করে উঠল। কিন্তু সুরঞ্জনা মুখ কালো করে বলল, আঃ, মা, ওই সব কথা বলবার আর সময় পেলে না তুমি? পরে হবে ওসব কথা।

মেয়ের ধমক খেয়ে মাকে চুপ করতে হল।

—চললাম রঞ্জনা। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার দিকে মৃদু কটাক্ষপাত করে বেরিয়ে পড়ল। সুরঞ্জনা পাষাণের মতো নিশ্চল হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

নিজের ঘরে ফিরে অত্যাবশকীয় কয়েকটা জিনিষপত্র কীট ব্যাগে ভর্ত্তি করে যুবনাশ্ব সুশোভনার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সুশোভনা কি যেন লিখছিল ঘাড় হেঁট করে। মুখ তুলে তাকালো।

—আমি চললাম সুশোভনা, এই দুমাস ধরে তোমাদের শুধু বিরক্তই করে গেলাম। অপরাধ যদি কিছু করে থাকি, নিজ গুণে ক্ষমা কোরো। ভালো করে পরীক্ষা দিও সুশোভনা।

যুবনাশ্ব চলে গেল। কিছুক্ষণ নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে থাকবার পর হঠাৎ রাগে সুশোভনা পার্কার পেনটা মাটিতে আছড়ে ফেলল। দাঁত দিয়ে সজোরে ঠোঁটটা চেপে ধরল। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

( দশ )

ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটে এসে নাম্বারটা খুঁজে নিতে যুবনাশ্বের বেগ পাবার কথা নয়। এখানেই তার কৈশোরের ষোলটা বছর কেটেছে। অবশ্য পাঁচ বছর ফারাকে চলমান পৃথিবীর রং অনেক বদ্‌লে গেছে।

অনেক ভেবেচিন্তে দ্বিধাশঙ্কিত হাতে আস্তে আস্তে যুবনাশ্ব দরজার কড়া নাড়ল।

দরজা না খুলেই কড়ার শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে চড়াস্বরে বামাকণ্ঠের গর্জন হল, কে—কি চাই?

যুবনাশ্ব আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, আমি—আমি—

—বলি আমি তো সবই—নাম কি?

যুবনাশ্ব কিছু বলবার আগেই দড়াম করে দরজার খিল খুলে মোষের মতো বিপুল বপু নিয়ে কাকীমা আবির্ভূত হলেন।

—কে যুবনাশ্ব না? কাকীমা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

—হ্যাঁ, কাকীমা আমি—

—বুঝেছি, জ্বালাতে এসেছ তো?

—আজ্ঞে, মানে—

—মানে আর তোমাকে বাপু করতে হবে না আমি সব বুঝে নিয়েছি। কলকাতায় থেকে চাকরীর চেষ্টা করবে আর যতদিন

চাকরীবাকরী না পাও ততদিন কাকার ঘাড়ে বসে অন্নধ্বংস করবে—এই তো মানে? বলি বাছা তোমার কাকার কি জমিদারী আছে? পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে যখন এসেছ তখন আর তুমি সহজে নড়বে না এ আমি বেশ জানি—এসো—

একটা কীটব্যাগ ছাড়া যুবনাশ্বের কাছে সত্যসত্যই কোনো পোঁটলাপুটলী ছিল না। কাকীমার স্বভাবচরিত্র তার জানা থাকলেও এমন অভ্যর্থনা পাবে এ তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অপরাধী আসামীর মতো নতমস্তকে যুবনাশ্ব কাকীমার নির্দেশ মেনে বাড়ীর ভিতরে এসে ঢুকল। কাকাবাবু তাঁর ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। কথাবার্ত্তায় টুকরো কানে যেতেই ক্ষুর ফেলে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় যুবনাশ্ব একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—কে যুবনাশ্ব না? কাকাবাবুর কপাল চিন্তাকুঞ্চিত হল। তাঁর মনে ভয় আছে যুবনাশ্ব বাড়ীর প্রাপ্য অংশ দাবী না করে বসে।

—হ্যাঁ, কাকাবাবু।

যুবনাশ্ব কাকার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবার জন্যে নত হতেই কাকাবাবু স্প্রিংএর মতো তিন হাত দূরে ছিটকে গিয়ে বললেন, থাক, থাক, অতো ঘটা করে নমস্কার করতে হবে না। কিন্তু কি মতলব নিয়ে এখানে এসেছ?

—মতলব আমার কিছু নেই কাকাবাবু—

—বেশ, বেশ, শুনে সুখী হলাম। তা' এসেছ যখন ছুদিন থেকেই যাও।

—বলি হাঁগা, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে? দেখছ না লটবহর সব সঙ্গে নিয়ে এসেছে—ছু' একদিন থাকতে আসিনি যদ্দিন চাকরী-বাকরী কিছু না মেলে ততদিন পাকাপোক্তভাবেই শিকড় গেড়ে থাকবে।

—এই বাজারে চাকরী অমনি পেলেই হল? একটা বছর চেষ্টা-চরিত্তির করে কয়েক জোড়া জুতো ক্ষয়াক তারপর একটা এল, ডি, মিললেও মিলতে পারে।

—বলি, হ্যাগা, তুমি তো বলেই খালাস। খেয়াল আছে যে তাহলে তোমার আদরের ভাইপোরত্নটি পায়ের উপর পা দিয়ে একটি বচ্ছর তুবেলা ভাত মারবে?

মানুষের মন যে এতো নীচ, এতো অনুদার, এতো সংকীর্ণ হতে পারে এ যেন ভাবা যায় না। যুবনাশ্ব আর স্থির থাকতে না পেরে বলল, দেখুন কাকীমা সত্যই আমি আপনাদের জ্বালাতন করছি কিন্তু বিশ্বাস করুন একান্ত নিরুপায় হয়েই আমি এখানে এসেছি। যদি অন্য কোথাও কোনরকম আশ্রয়ের সম্ভাবনা থাকত তাহলে আমি এখানে আসতাম না। কথা দিচ্ছি এক মাসের একদিনও বেশী আমি এখানে থাকব না—চাকরী পাই আর না পাই।

আশ্বস্ত গলায় কাকীমা বললেন, বলি চাকরী না পেলে যাবে কোন্ চুলোয়?

—রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করব কাকীমা।

কাকীমা উনানে রান্না চাপিয়ে এসেছিলেন। কাকার অফিস যাবার সময় হয়ে গেছে। কথা না বাড়িয়ে তুজনেই নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন।

যুবনাশ্ব চুপ করে বারান্দার একপাশে বসে তার তুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল। আজ সে স্ববাসী নয়, প্রবাসী নয়। এ তুর্ভাগ্যকে তার মেনে নিতেই হবে। কাকা ভাত খেয়ে ছাতা বগলে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে অফিস চলে গেলেন। যুবনাশ্বের সঙ্গে একটা কথা বলারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। ব্যথাহত যুবনাশ্ব এলোমেলো চিন্তা করে চলল। বিদায় বেলায় সুরঞ্জনার অশ্রুসিক্ত বিষাদ করুণ মনখানি ভেসে আসে। সুরঞ্জনার কথা মনে এলেই চেতনায় এক নতুন অনুপ্রেরণার সঞ্চার হয়।

সহসা কাকীমার বায়সনিন্দিত কর্কশ কণ্ঠস্বরে যুবনাশ্বের চিন্তাজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

—বলি ভালোমানুষের ছেলে কথা কাণে ঢুকচে—ভাত রান্না হয়ে গেচে—কন্ট্রোলের বাজার, বাড়তি ভাত হাঁড়িতে থাকে না—তোমার জন্যে খানকতক রুটি সেঁকেচি তাই খেয়ে এখন আমায় উদ্ধার কর। রাত্রে আমার কালোসোনার ঘরেই শোবে। বলি, চানটান এখন করা হবে, না হবেনা ?

কাকীমাকে আর ঘাঁটাতে যুবনাশ্বের সাহস হল না। তাড়াতাড়ি সে বলল, হ্যাঁ কাকীমা চান করছি। একটু তেল দেবেন ?

—তেল বাপু ফুরিয়ে গেছে ! সঙ্গে তেল না এনে থাকো অমনি চান করে এসোগে যাও।

যুবনাশ্ব আর কথা বাড়িয়ে কাকীমাকে ঘাঁটাতে সাহস পেল না। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে নিজের গামছাখানি বার করে নিয়ে কলঘরের দিকে চলে গেল। স্নান করে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর কাকীমা চটাওঠা কানাভাঙ্গা কলাই থালায় মাত্র চারখানা কাঠ কাঠ শক্ত রুটি আর একটু বর্ণহীন আলুর তরকারী বসিয়ে দিয়ে বললেন, আমি হেন মেয়েছেলে বলে এতো বেলায় আবার পুরো এক গণ্ডা রুটি তৈরী করলাম, অন্য মেয়েমানুষ হলে কেমন করত দেখতাম !

যুবনাশ্বের বুঝতে বিলম্ব হলো না যে তৈরী রুটির সংখ্যা নির্দেশ করে কাকীমা প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন যে আর চাইলে তিনি যোগান দিতে পারবেন না। যুবনাশ্ব ভাবতে পারে না যে, মানুষ কতোদূর নীচে নামলে তবে খাওয়া নিয়ে খোঁটা দিতে পারে। চরম বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল যুবনাশ্ব যখন দেখল যে বারান্দায় তাকে খেতে দিয়ে কাকীমা নিজে রান্নাঘরে ভাতের থালা নিয়ে পেটের কাপড় আল্‌গা করে দিয়ে খেতে বসেছেন। বারান্দা থেকেই যুবনাশ্ব স্পষ্ট দেখতে পেল একটা বিরাট কাঁসারীর থালায় ভাতের

পাহাড় আর তারপাশে ডাল তরকারীর কয়েকটি বাটি পরপর সাজানো। যুবনাশ্বের দুচোখ জ্বালা করে উঠল। মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। তাকে বেশী করে ভাত খাওবার জন্যে তার মায়ের কতো সাধ সাধনা। কতো অভিনব ছলছাতুরী। তারাও তো গরীব ছিল। কতো ছোট ছোট কথা মনে এসে যায়। দুপুর বেলায় অভুক্ত ভিখারী এসে বলেছে মা আজ সারাদিন কিছু খাইনি—চারটে ভাত দেবে মা? হাসি মুখে মা বাড়া ভাত আগ্ বাড়িয়ে তাকে ধরে দিয়েছে। একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে আর একজন মেয়েমানুষের এই দুস্তর ব্যবধান হয় কি করে? যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি রুটি চারখানা চিবিয়ে অনেকখানি জল খেয়ে পেট ভর্ত্তি করল। খেয়ে উঠে রাস্তায় পা বাড়িয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এমপ্লয়মেণ্ট এক্স্‌চেঞ্জে যাবার জন্যে ডালহৌসীর ট্রাম ধরল যুবনাশ্ব। কিন্তু এখানকার রকম সকম দেখে বুঝল এখানে ঘোরাফেরা নিরর্থক। কোনো লাভ হবে না। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বহুক্ষণ পথে পথে ঘুরল। দজ্জাল কাকীমার ক্ষুরধার রসনার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবানের কথা ভেবে সন্ধ্যার আগে বাসায় ফিরে যেতে মন চাইল না। আন্‌মনে লক্ষ্যবিহীন দূরের পানে চলতে চলতে কখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে এসে গেল যুবনাশ্ব। সায়াহ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্লান্ত মন শ্রান্ত দেহ ঘাসের বুকে এলিয়ে দিল। তার মনের প্রেক্ষাপটে বহু চিত্র ভেসে গেল। চাকরী না মিললেও, শোনা যায়, কলকাতায় ভালো ভালো প্রাইভেট টিউশান পাওয়া যায়। সে রকম একটা দুটো ছাত্রছাত্রী পেলে মন্দ হত না। কিন্তু জানাশোনা না থাকলে তার মতো অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কে মাষ্টারী দেবে?

—আরে উধার কৌন্ হ্যায়? যুবনাশ্বের মুখে হাজার ব্যাটারীর এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়তেই সে চমকে উঠল। তার চিন্তাজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আলো ফেলে কনেষ্টবলটি কাছে এগিয়ে এলো।

ঘাব্‌ড়ে গেলেও সাহস দেখিয়ে যুবনাশ্ব বলল, ফ্রেণ্ড হ্যায়। —হিঁয়াসে তুম কিয়া করতা ?

—কিছু কর্‌তা নাই বাবা—শুধু বসে বসে শোচ্‌তা।

আশে পাশে কেউ নেই দেখে কনেষ্টবলটির বোধ হয় বিশ্বাস হল। বিশুদ্ধ রাষ্ট্র ভাষায় সে যা বলল তার বাংলা অর্থ হল যে রাত নটার পর আর এখানে থাকার আইন নেই অতএব তুমি এখান থেকে সরে পড়।

যুবনাশ্ব পালাতে পারলে বাঁচে। তার অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। বাড়ী ফিরে দেখলে দরজায় খিল পড়ে গেছে। কাকীমার মেজাজ যুবনাশ্বের হাড়ে হাড়েই জানা আছে তাই কাকীমা জেগে আছে কিনা জানবার জন্যে সে দরজার গোড়ায় কান পাতল। হ্যাঁ, কাকীমা জেগে আছেন। কাকীমার গলার টুকরো টুকরো কথা দরজার রন্ধ্রপথ দিয়ে সবই শোনা গেল।

—হ্যাঁগা, তুমি বলছিলে এতো রাতেও যখন বাড়ী ফিরল না তখন সে আর ফিরবে না—নিশ্চয়ই গাড়ী চাপা পড়ে মরেছে। আমি হল্‌প করে বলতে পারি সে কক্ষনো মরেনি—সে মরলে আমি গঙ্গাচান করে কালীঘাটে সওয়া পাঁচ আনা পূজো দিয়ে আসব। তোমার ওই বাপেখেদানো মায়েতাড়ানো ভাইপোটি অতো সহজে নিস্কৃতি দেবে না এ আমি বলেদিলাম।

এই ধরণের কিছু কিছু কথার টুকরো যুবনাশ্বের কানে যেতেই সে থেমে পড়ল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সে কিছুক্ষণ পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে কড়া নাড়তে গিয়ে নিজেকেই যেন তার অপরাধী বলে মনে হল। কাকীমা অসম্বৃত বাসে থপ্‌থপ করে এসে সশব্দে দরজা খুলে দিয়ে বাজখাই গলায় বললেন, তা বাছা এতো রাত্তির পর্য্যন্ত ছিলে কোথায় ? যেখানে গিয়েছিলে সেইখানেই তো রাতটা কাটাতে পারতে। এটা বেবুশ্যে বাড়ী নয়। ভদ্দর লোকের বাড়ী। যখন খুসী আসা যাওয়া

চলবে না—আমার বাড়ীতে কোনো কেচ্ছেচার আমি সহ্য করব না। বলি, বাছা কিছু বারটান আছে নাকি?

কাকীমার পঙ্কিল মনের নোংরামি যুবনাশ্বের কাছে অসহ্য বলে মনে হল। আর চুপ করে থাকতে না পেরে সে বলল, সকালে আসা থেকে এখন পর্য্যন্ত অনেক অপমানই তো করলেন কাকীমা—মুখ বুজে কোনো প্রতিবাদ না করে নীরবে সব সহ্য করেছি, এতেও আপনার আশা মেটেনি? দোহাই আপনার, এই রাত তুপুরে আর চেঁচামেচি করে লোক জড় করবেন না।

কাকাবাবু বিছানায় শুয়ে হাই তুলে পাশ ফিরে যাকে পাবার কথা তাকে না পেয়ে পাশ বালিশটাকেই নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বললেন, আঃ,—ওগো শুনছ—চলে এসো, রাত্তিরে গণ্ডোগোল করে না, তোমার বাক্যবানগুলো কালকের জন্য মুলতুবী রাখ।

কাকীমা গজ্‌গজ করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, রান্নাঘরের এক পাশে রুটি ঢাকা আছে, খেয়ে মাতুর পেতে কালোসোনার ঘরে শুয়ে পড়গে। কথা শেষ করে কাকীমা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিলেন।

যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে রান্না ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখলো একটি থালায় চারখানা রুটি আর পাশে একটু আলুর তরকারী পড়ে রয়েছে। একটা বিড়াল পাশে বসে ধীরে সুস্থে আনন্দে রুটি খাচ্ছে। অনাদরের বেদনায় যুবনাশ্বের তুচোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে মুখে এসে পড়ল। অস্ফুটস্বরে শুধু সে একবার বলল, মা! ক্ষুধার আগুনে পেটের নাড়ী পাক খাচ্ছে। বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দিয়ে অর্দ্ধভুক্ত রুটিতে যুবনাশ্ব কামড় দিল। কোনো রকমে রুটি চিবিয়ে যুবনাশ্ব শুয়ে পড়ল। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা আর সারাদিনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা তার চোখ থেকে ঘুমের আমেজ কেড়ে নিয়েছে। অনেক রাত ধরে মনের ক্যানভাসে হিজিবিজি রেখা

এঁকে চলল মুসাফির মন। এখান থেকে যত শীঘ্র সরে পড়তে পারা যায় ততই মঙ্গল। সঙ্গে যা টাকাকড়ি আছে তাতে একটা মাস মেসে থাকা চলতে পারে। সুরঞ্জনার মধুর স্মৃতি বন্ধ্যা ভবিষ্যতের বেদনা ভুলিয়ে দেয়। কিছু না থাক তার সুরঞ্জনা আছে। তার সব কিছু চাওয়া পাওয়া লেনদেনের পরম পরিপূর্ণতা।

চাকরীর জন্যে যুবনাশ্ব কিছুদিন টালা থেকে টালিগঞ্জ হুলিয়া করে ঘুরে বেড়ালো। কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখতে না পেয়ে মনে মনে সে তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার একটা পাঁয়তাড়া ভেঁজে ফেলল। শিয়ালদা ষ্টেশনের মোড়ে সকালবেলা সংবাদপত্র ফেরি করবে সে। কলেজী জীবনের স্বপ্ন-রোমান্স ভেঙ্গে যাওয়ার বেদনা অন্তরে খুবই বাজে কিন্তু পরিবর্ত্তন এবং পারিস্পার্শিকতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার মতো বোধ এবং বোধি তার আছে।

কয়েকদিন ব্যর্থ চেষ্টায় কাটল। ক্লান্ত দেহে রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে সুরঞ্জনার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল সুরঞ্জনার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রতি সপ্তায় অন্ততঃ একখানা করে চিঠি দেবে। কিন্তু এতোদিন হল একটি চিঠিও সুরঞ্জনাকে লেখা হয়নি। মানে হয়ে ওঠেনি। যুবনাশ্ব একবার চারদিক চকিতে তাকিয়ে দেখে নিল। কালোসোনা এখনো ফেরেনি। কোনো কোনো দিন রাতে সে ফেরেই না একেবারে। কাকামা ছেলের চরিত্র সংশোধন করবার জন্যে অনেকদিন থেকেই পাত্রী দেখছেন। আশ্চর্য কথা, যে বাংলাদেশে ভিখারীরও বিয়ে হয় তেমন দেশেও তার পাত্রী মিলছে না। যুবনাশ্ব একটা কাগজ ভাঁজ করে মাদুরে বসে খস্ খস্ করে লিখে চলল: রঞ্জনা, কলকাতায় পৌঁছানোর কয়েকদিন পরে তোমায় পত্রাঘাত করছি। দেরী হয়েছে বলে সবটা না পড়ে রাগের মাথায় চিঠিটা যেন ছিঁড়ে ফেলো না লক্ষ্মীটি। যা অভিমানী মেয়ে তুমি! এখনো পর্য্যন্ত কোনো কাজ কারবার জোটাতে পারিনি। জানো রঞ্জনা, এই মহানগরী বড়ই

কৃপণ—এখানে মাথা গোঁজবার মতো ঠাঁই করে নেওয়া বড় কঠিন—ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। চারিদিকে জীবনের সফেন সমুদ্র আর তার মাঝে আমি এক ক্লান্ত প্রাণ লক্ষ্যভ্রষ্টতায় জীবনের গলি থেকে রাজপথে ছুটে বেড়াচ্ছি। এখানে এসে থেকে আজ পর্য্যন্ত রোজই তোমার কথা ভেবেছি রঞ্জনা। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বিশ্বাস হবে এমন একটা আজকের episode বলি শোনো। আজ দুপুর বেলা অন্যমনস্কভাবে মনে তোমার মানচিত্র আঁকতে আঁকতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কাকার বাড়ী কোনোদিনই পেট ভরে খাওয়া হয় না। কিছুদূর চলবার পর রাস্তার ধারে একটা রেস্তোরা চোখে পড়ল। লোভ সামলাতে না পেরে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বেশ মৌজ করে এক টাকাব চপ কাটলেট খেয়ে আমীরী মেজাজে হাই তুলতে তুলতে ব্যাগ বার করবার জন্যে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েই চমকে উঠলাম। পকেটে ব্যাগ নেই। পকেটগুলো হাতড়ালাম কিন্তু সব পকেটই শূন্য। চক্ষু ছানাবড়া। একেই বলে tighest corner. আমি অপরাধীসুলভ কুণ্ঠিতকণ্ঠে ম্যানেজারকে বললাম, দেখুন আমার ব্যাগটা নিশ্চয়ই রাস্তার কোথাও পড়ে গেছে—আমার কাছে এখন কোনো পয়সা নেই—এই পেনটা জমা থাক, পবে টাকা দিয়ে আমি এটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো। ম্যানেজার সাহেব বোধ হয় আমার দুরবস্থা বুঝলেন। বললেন, থাক পেন জমা রাখতে হবে না, বাড়ী থেকে টাকা এনে দিয়ে যাবেন। বিষন্নমনে বাড়ী ফিবে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাগটা কেউ চুরি কবেনি বাস্তায়ও পড়ে যায়নি—বিছানাব উপরই বয়েছে। কোনো দিনই আমি এতো ভূলো ছিলাম না, এখন কেন এমন হল? কিসের জন্যে এই দিক্‌দারী? মনকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলাম, মন আমার ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটে নেই বাবুগঞ্জের সুরঞ্জনা ভট্টাচার্যের কাছে বাঁধা রয়েছে। মনের ক্যামেরা দিয়ে তোমার কতো ছবি যে আমি রোজ তুলি কেমন করে সেকথা

তোমায় জানাবো সু ? নীল যমুনার তীরে বসে জ্যোৎস্নাযামিনী যুগ যুগ ধরে শুধু প্রেমের অভিসারে বিরহের স্বপ্নসৌধ তৈরী করে যাবে ? রঞ্জনা, তুমি আমার রাতের স্বপ্ন, দিনের প্রেরণা। রঞ্জনা, আজ আর নয়। এখানেই শেষ করি—আলো জ্বেলে প্রেমপত্র লিখছি জানতে পারলে কাকীমা কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। নিচে বাড়ীর ঠিকানা দিলাম—পত্রপাঠ অবশ্য চিঠি দিও।

কাগজ থেকে কয়েকটা অফিসের নাম ঠিকানা টুকে নিয়ে যুবনাশ্ব একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে বার হল। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। ক্লান্ত পদবিক্ষেপে ঘুরে ঘুরে শ্যামবাজারের ট্রামে ওঠবার জন্যে এসপ্লানেডের ঘুমটির দিকে সে এগিয়ে চলল। সহসা তার সন্দেহ হল অনেকক্ষণ ধরেই একটি তরুণী তার পিছু পিছু আসছে। যুবনাশ্বের সর্বশরীর ঘেমে উঠল। দু একবার আড়চোখে পিছন ফিরে এবং চলার গতি যথাক্রমে শ্লথ এবং দ্রুত করে যুবনাশ্ব তার সন্দেহের সততা সপ্রমাণ করল। একটি লিপ্‌স্টিক ঘসা এ্যাঞ্জেলফেস লাবণ্যময়ী অচেনা তরুণী তাকে অনুসরণ করছে এ কথা চিন্তা করতেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তার চেয়ে বেশী অস্বস্তি বোধ করল। তরুণী মেয়েটিকে এড়াবার জন্য যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি সামনে যে ট্রাম পেল তাতেই উঠে পড়ল। মেয়েটিও ট্রামে উঠে বসল। বেলা চারটের মতো হবে, ট্রামে ভিড় ছিল না। দু'জনে বসা যায় এমন একটা খালি সীটে জানালার ধার ঘেঁসে যুবনাশ্ব বসল। তরুণীটিও নিঃসঙ্কোচে তার পাশে গিয়ে বসল। যুবনাশ্ব বিচলিত হল। সে ভুল করে লেডিস্ সীটে বসে পড়েনি তো ? কিন্তু সীটের পিছনটা দেখে আশ্বস্ত হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়েটি তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে মুচ্‌কী হাসছে। কোনো শিকার সন্ধানী এ্যাডভেঞ্চার গার্ল নয় তো ? মনে মনে কৌতুহল হল। আম্‌তা আম্‌তা করে যুবনাশ্ব বলেই ফেলল, দেখুন, লেডিস্ সীটগুলো প্রায় সবই খালি রয়েছে।

এতটুকু দ্বিধা না করে মেয়েটি তৎক্ষণাৎ রেডিমেড উত্তর দিল: এটা জেন্টস্ সীট বলে কোথাও লেখা আছে কি?

যুবনাশ্ব এমন উত্তর মোটেই আশা করেনি। ভেবেছিলো মৃদু আপত্তি জানানোর সাথে সাথে ভদ্রমহিলা উঠে যাবেন। লজ্জা পেয়ে সে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। কিন্তু ইতিমধ্যে তার মনের মধ্যে এই সুন্দরী মেয়েটির সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জেগে উঠেছে। মেয়েটি কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে দেখবার জন্যে ঘাড় ফেরাতেই দুজনের দৃষ্টিতে কলিসান হয়ে গেল। চোখাচোখি হতেই তরুণীটি ফিক্ করে হেসে ফেলল। লজ্জা পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যুবনাশ্ব কলেজ ষ্ট্রীটেই নেমে পড়ল। আশ্চর্য্য মেয়েটিও তার পিছু পিছু নেমে পড়ল। যুবনাশ্বের কৌতূহল কৌতুকে রূপ নিচ্ছিল। সে বলে ফেলল, আপনি কোথায় যাবেন?

—আপনার বাড়ী। মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে বলল।

—আমার বাড়ী নেই, একটা সাময়িক আস্তানা আছে মাত্র। কিন্তু এখন আমি সেখানে যাবো না—কলেজ ষ্ট্রীটে ঘুরে বেড়াবো।

—বেশ তো, বেড়াতে আমারও খুব ভাল লাগে—আপনার সঙ্গে বেড়াবো আর কলেজষ্ট্রীটের রূপকথা শুনব।

আচ্ছা গায়েপড়া নাছোড়বান্দা পুংশ্চলী তো! হেসে ফেলল যুবনাশ্ব। তারও বেশ মজা লাগছিল। এতোদিন পর্য্যন্ত সে জানত ছেলেরাই মেয়েদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোনো মেয়েও যে ছেলের পিছনে ঘুরে বেড়াতে পারে এ অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। ললনার ছলনা বোঝাবার মতো অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অবশ্য তার জীবন নয়। যুবনাশ্ব এতক্ষণে জড়তা এবং সংকোচ প্রায় সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠেছে। সে মেয়েটিকে সহজভাবে বলল, অর্থহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হওয়ার চাইতে আসুন কফি হাউসে ঢোকা যাক।

—উঁ-হুঁ। প্রক্সি ম্যানেজ করে ক্লাশ পালানো ছেলের ভিড়ে

কফি হাউসের আবহাওয়া এখনো উত্তপ্ত। ওই ভীড় আর হৈ-হট্টগোলের মধ্যে না গিয়ে বরং চলুন ওয়াই এম, সি-এর শান্ত রেঁস্তোরার নিভৃত কোণে।

—বেশ, তাই চলুন।

যুবনাশ্ব দু'কাপ কফির অর্ডার করল।

তরুণীটি মোনালিসা হাসি হেসে বলল, শুধু কফি? আর কিছু না? আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়েছে।

পকেটের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে যুবনাশ্ব বিপন্নবোধ করল। মেয়েটি বোধহয় সব বুঝল। সমস্যার সমাধান করে দিয়ে সে বলল, আপনি আমায় কফি খাওয়াবেন আমি আপনাকে একপ্লেট মাংস খাওয়াই—মানে give and take policy হল আর কি!

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মেয়েটি বলল, আমার নাম মহাশ্বেতা রায়, আপনার নাম কি?

—যুবনাশ্ব লাহিড়ী।

—আমি এবছর আই, এস, সি পরীক্ষা দিয়েছি। ইচ্ছা আছে মেডিক্যাল সায়ান্স পড়ব। আপনি কি করেন?

যুবনাশ্ব মৃদু হেসে বলল, চাকরীর চেষ্টা করি মানে বেকার।

যুবনাশ্ব ভাবল তার এই পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই মহাশ্বেতা সরে পড়বে। কিন্তু দেখা গেল সে তার পিছন ছাড়েনি। রেঁস্তোরা থেকে বেরিয়ে যুবনাশ্ব বলল, আপনার কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার মানে তো বিদায়? ও হচ্ছেনা, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

বিপন্ন বোধ করল যুবনাশ্ব।

—দেখুন মহাশ্বেতা দেবী—আপনি—আপনি—মানে—

—মানে আপনার বাবার সঙ্গে আমার কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা আছে।

বেদনার্ত্তকণ্ঠে যুবনাশ্ব বলল, অনেকদিন আগে আমি বাবাকে হারিয়েছি মহাশ্বেতা দেবী।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মহাশ্বেতা তার দুঃখে সহানুভূতি জানালো।

—আপনার অভিভাবক কে আছেন ?

—আমার অভিভাবক কেউ নেই—আমি নিজেই নিজের অভিভাবক। আমি এখানে কাকার কাছে থাকি।

—আপনার কাকাকে হলেই চলবে।

--কাকাবাবু এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। পাঁচটার পরিবর্ত্তে আটটা পর্য্যন্ত অফিসে থাকেন extension পাবার আশায়।

—কাকীমা আছেন তো ?

—হ্যাঁ—তা আছেন।

--তা'হলেই আমার চলবে।

মনে মনে যুবনার্শ্ব হতাশ হয়ে পড়ল। কিছুতেই মহাশ্বেতাকে এড়ানো গেলনা। কিন্তু তার অভিভাবকের সাথে ওর কি প্রয়োজন থাকতে পারে তাও বোঝা গেল না।

যুবনাশ্বের পিছু পিছু মহার্শ্বেতাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে রান্নাঘর থেকে কাকীমা চিৎকার করে উঠলেন, ওমা, এসব কি অনাছিষ্টি কাণ্ড! সঙ্গে আবার একটি দামড়া মেয়ে। যা ভেবেছি ঠিক তাই—এসেই ছোঁড়াটা লটঘট করে ফেলেছে। ধন্যি ছেলে! বলি বাপু এসব ফস্টিনস্টী এখানে চলবেনা—

—আমার কথাটা আগে শুনুন কাকীমা! আমি ওঁকে ডাকিনি, নিষেধ করা সত্ত্বেও উনি আমার পিছন পিছন এসেছেন। আমি সত্যি বলছি কিনা সেটা আপনি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

—দেখো বাপু ওসব শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল আমার ঢের ঢের দেখা আছে। জানা নেই, শোনা নেই, চোখ ঠেরে না ডাকতেই অমনি একটা সোমত্ত মেয়ে তোমার মতো ঢ্যাড়োস ছেলের পিছু পিছু

বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করল। বলি আমার কি চোখকান নেই? আমায় ন্যাকা পেয়েছ? ওসব ফষ্টিনষ্টি আমার ঢের ঢের দেখা আছে।

—দেখুন মাসীমা, যুবনাশ্ববাবু ঠিক কথাই বলেছেন—আমিই ওঁর পিছু পিছু এসেছি—উনি আমায় ডাকেননি আমি ওঁকে ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি।

এই অশ্রুতপূর্ব কাহিনী এবং অদৃষ্টপূর্ব স্বীকারোক্তি শুনে কাকীমা তাজ্জব বনে গেলেন। মহাশ্বেতা কাকীমার দিকে ফিরে বলল, আমার এই অদ্ভুত আচরণ শুধু আপনাকেই নয় যুবনাশ্ব বাবুকেও বিচলিত করেছে। ব্যাপারটা সব খুলে বললে আপনাদের মনে সন্দেহের দোলা আর এতটুকুও থাকবেনা। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন হয় আমার মাথা খারাপ, নয় চরিত্র খারাপ। আসলে ছুটোর কোনটাই সত্য নয়। আমার বাবা বীরেন রায় একজন নামকরা বিজনেট ম্যাগনেট। বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ী। সেকেণ্ড ইয়ারের গোড়ার দিকে বাবা আমার বিয়ের কথা পাড়লেন। বিয়েতে আমার অনিচ্ছা নেই জেনে বাবা ভালো ভালো ছেলের সম্বন্ধ আনতে লাগলেন, প্রায় একবছর ধরে অনেক ছেলেই দেখলাম কিন্তু কোন ছেলেই আমার পছন্দ হয়না। বাবা হাল ছেড়ে ছেলে পছন্দ করবার ভার আমাকেই ছেড়ে দিলেন। আমি নিজে থেকে কোন ছেলে পছন্দ করলে বাবা তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। যুবনাশ্বকে দেখে আমার মনে হয়েছে এই ছেলেকেই আমার মন যেন এতোদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

কথাবার্ত্তায় নষ্টামি, ধষ্টামি আর নির্লজ্জতার বহর দেখে কাকীমা স্তম্ভিত। কোনো মেয়ে নির্লজ্জের মতো নিজমুখে কোন ছেলেকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে এটা অদৃষ্টপূর্ব। অভাবনীয়। এতোখানি বেলেল্লাপনা বনেদীবংশের মেয়ে কাকীমা কিছুতেই সহ্য করবেন না।

তাছাড়া এমন একজন সুন্দরী মেয়ে তাঁর দু'চক্ষের বিষ ছোঁড়াটার সঙ্গে প্রেম করবে আর প্রাণান্ত চেষ্টা করেও নিজের ছেলের জন্যে একটীও পাত্রী মিলবেনা এটাও সহ্য করা যায় না। রাগটা সেখানেই।

—বলি বাছা, তুমি তো লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে বসে আছ—কিন্তু আমরা গেরস্ত লোক, আমাদের লজ্জাঘেন্না আছে। ভালোয় ভালোয় সরে পড়, ওসব ছেনালী আমার ঢের ঢের দেখা আছে। নিশ্চয়ই তোমার কিছু কুমতলব আছে, আর না হলে তিনবার গর্ব খসিয়েছ, তা নইলে ওই বেকার বাউণ্ডুলে ছেলের গলায় মালা দেবার জন্যে অতো সখ কেন শুনি? তুমি সরে পড় বাছা—নইলে আমি কেলেঙ্কারীর একশেষ করব কিন্তু।

মহাশ্বেতা যুবনাশ্বর দিকে বিষাদ-ম্লান চোখ তুলে বলল, চললাম যুবনাশ্ব। It was beyond my comprehension that I should get such reception from your relatives. Your aunt is meanness incarnate. মহাশ্বেতা চলে গেল।

—মহাশ্বেতা চলে যেতেই কাকীমা যুবনাশ্বের দিকে ফিরে মারমুখো হয়ে বললেন, ছুঁড়িটা ইংজিরিতে কি সব গালাগালি দিল শুনি?

মহাশ্বেতার সংকোচহীন অকৃত্রিম সরলতা যুবনাশ্বকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। এমন মেয়েকে কার না ভালো লেগে পারে? কাকীমার কর্কশ কণ্ঠ যুবনাশ্বকে কঠিন বাস্তবের গ্রানাইট পাথরে আছড়ে ফেলল। তাড়াতাড়ি সে বলল, গালাগালি কিছু না। বলল যে এই রকম নোংরা ব্যবহার সে মোটেই আশা করেনি।

—হুঁ কার মেয়ে যেন বলল?

—বিজনেস্ ম্যাগনেট।

—বলি ওর বাংলা মানে কি?

—খুব বড় ধনীব্যবসায়ী।

কাকীমার ভাবান্তর হল। মনে মনে আবৃত্তি করলেন ধনী ব্যবসায়ীর মেয়ে। বালিগঞ্জে বাড়ী।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়েও চাকরী মিলল না দেখে যুবনাশ্ব আসন্ন কার্য্যক্রমের খস্‌ড়া করে ফেলল। পরের দিন অতি প্রত্যুষে কাকাবাবু এবং কাকীমাকে একটা করে সর্বসাকুল্যে মোট দুটো প্রণাম ঠুকে কীট ব্যাগ গুটিয়ে সার্পেনটাইন লেনের পাইস হোটেলে এসে আস্তানা গাড়ল। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাতের আঁধার থাকতে থাকতে যুবনাশ্ব সংবাদপত্র হাতে নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশানে এসে দাঁড়ালো। লজ্জা আর সংকোচের জড়তা এসে তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিল। চারি পাশের হকাররা তার দিকে বিদ্বেষভরা চোখে চাইল। একজন সমব্যবসায়ী নতুন ভাইকে নিজেদের মধ্যে স্থান দিতে তারা কুণ্ঠীত। অবশ্য দু'একজন কাছে এসে তার সঙ্গে যেচেই কথা বলল।

—কি ভাই আজ বুঝি নতুন আমদানী ?

—হ্যাঁ।

—পরীক্ষায় ফেল হয়েছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—পাকিস্তান থেকে আইছ্যান ? দ্যাশের লোক ?

—হ্যাঁ।

—ষ্টেটবাসে লোক নিচ্ছে, চেষ্টা করেন।

—করবো।

—আচ্ছা, পরে আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। এখন কাজ করেন—আনন্দবাজার—স্বাধীনতা—ষ্টেটস্‌ম্যান—জোর খবর—

যুবনাশ্ব চেষ্টা করেও চেঁচাতে পারে না। তার কণ্ঠস্বর আট্‌কে যায়। সে কাগজ হাতে করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তার কাগজ বিক্রী হতে অবশ্য দেরী হয়না। এমন একটি কান্তিমান সুদর্শন যুবককে কাগজ বিক্রী করতে দেখে ব্যস্তবাগীস্ চলমান ডেলী-

প্যাসেঞ্জারের দল একবার তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। কোনো-দিন কাগজ কেনার প্রয়োজন বোধ করেনি এমন অনেক কর্মজীবী মেয়ে তার কাছ থেকে কাগজ কিনল।

অনভ্যস্ত হাতে যুবনাশ্ব পয়সা গুণে নিল। হাসিখুসী ভরা হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দশদিক সরগরম করে কলেজ চলেছে। এদের দেখে যুবনাশ্বের দুচোখ বেদনায় জলে ভরে আসে। যাই হোক, বেলা বারোটা বাজবার আগেই দেখা গেল তার সব কাগজ বিক্রী হয়ে গেছে। অবশ্য নতুন ব্যবসায় বলে সে কম সংখ্যক কাগজই কিনেছিল। কাগজ বিক্রী শেষে যুবনাশ্ব মেসে ফিরে এলো। কাকার বাড়ীতে থাকার দুঃসহ গ্লানি আর সহ্য করতে হবে না। তা ছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের রোজগারে খাওয়ার আনন্দে একটি পৌরুষ আছে।

## ( বারো )

যুবনাশ্বের সঙ্গে তার কাকীমার সম্বন্ধ কতো মধুর সেটা ভালোভাবেই বুঝে ফেলেছে মহাশ্বেতা। তাই সে খুব বেশী বিচলিত হয়নি। যুবনাশ্বকে তার চাই। রাত্রে বাবুজী বাড়ী ফিরতেই মহাশ্বেতা আব্দার করে বাবার কাছে এগিয়ে গেল।

—আয় মা? বীরেনবাবু আদর করে কন্যাকে কাছে টেনেনিলেন।

মহাশ্বেতা বাবার মাথায় পাকাচুল খুঁজতে খুঁজতে বলল, বাবুজী—

—কি মা, কিছু বলবি? বুঝিছি তোর টাকার দরকার পড়েছে তো?

বাবার মাথায় একটী পাকাচুলে সজোরে টান দিয়ে কৃত্রিম

কোপের সঙ্গে মহাশ্বেতা বলল, তুমি কিচ্ছু বোঝোনি—তোমার কাছে এলে বুঝি শুধু টাকারই দরকার হয়?

—পাগলী মায়ের অমনি রাগ! দেরাজের চাবি তোর মায়ের কাছে আছে—একটা একশো টাকার নোট নিস।

—আঃ! মহাশ্বেতা এবার সত্যসত্যই বিরক্ত বোধ করল।—তুমি বাবুজী আগে থেকেই সব ভুল বুঝে বসে থাক। টাকা আমার দরকার নেই।

—টাকা ছাড়া আমার কাছে তোর আর কি চাইবার থাকতে পারে পাগলী? আর চাইবার মধ্যে একটা ভালো বর—তা' বিয়ে তুই যখন করতেই চাইছিস্ না—

—কে তোমায় বলল আমি বিয়ে করতে চাই না? মহাশ্বেতা কথাকটি বলে ফেলেই লজ্জায় বাবুজীর বুকে মুখ লুকালো।

—কোনো ছেলেই তোর পছন্দ হয় না—মানে তুই বিয়ে করতে চাসনা সেটাই তো অপ্রত্যক্ষভাবে বলিস।

উঃ, horrible! ওই মোটা বুদ্ধি নিয়ে তুমি কি করে ব্যবসায় কর বাবুজী আমি বুঝতে পারিনা। ওই বুদ্ধি invest করে ব্যবসায় চালালে এতোদিনে তোমার liquidationএ যাওয়া উচিৎ ছিল। জানো বাবুজী—

ইতস্ততঃ করল মহাশ্বেতা।

—কি বলতে চাস, বলনা মা?

—যুবনাশ্ব লাহিড়ী বলে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হল—মানে আলাপ করলাম—ভারী ভালো ছেলে বাবুজী।

বীরেনবাবু হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, এই প্রসঙ্গের জন্যে এতো গৌরচন্দ্রিকা।

—যাওঃ, ঠাট্টা করলে তোমার সঙ্গে একটা কথাও আর বলবনা বলে দিচ্ছি।

—যাক্ বাঁচালি মা। ওই ছেলেটিকে তোর পছন্দ হয়েছে।

এতোদিন খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হবার পর যে তোর মনের মতো ছেলে মিলেছে এতেই আমি খুসী। আর লহিড়ী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সব গোলই মিটে গেল। অসবর্ণ বেজাত করিসনি এই ঢের। ছেলেটি বিবাহিত নয়তো ?

—তুমি আমায় যতো বোকা ভাবো বাবুজী আসলে কিন্তু আমি তত বোকা নই। সে সব ঠিক আছে—কিন্তু বাবুজী ছেলেটি বড্ড গরীব—বেকার।

বীরেনবাবু কন্যার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আমার জামাই হলে সে আর গরীব বেকার থাকবে না মা। এখন শুধু জানা দরকার ছেলেটির স্বভাব চরিত্র কেমন।

—একঘণ্টা আলাপেই আমি বুঝে নিয়েছি তার চরিত্র কতো সুন্দর, কতো নির্মল। বাজে বকা গায়েপড়া ছেলে হলে, যেচে আলাপ করতে গেলে সে আমায় ঘোল না খাইয়ে ছাড়ত ভেবেছ ?

—কোথায় থাকে ছেলেটি, খোঁজ নিয়েছিস মা ?

—তুমি বুঝি আমাকে বোকা মেয়ে পেয়েছ ? যদি মিথ্যে ঠিকানা দেয় সেইজন্যে পিছু পিছু সোজা ওর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। শ্যামবাজারের ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটে থাকে।

—আচ্ছা মা, কাল বিকেলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে ছেলেটিকে দেখে আসব।

পরের দিন বিকেলে বাবুজীকে নিয়ে মহাশ্বেতা ভবনাথ সেন ষ্ট্রীটে এসে হাজির হল।

—এসো এসো মা—

কাকীমা সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

কাকীমার কাছে কি ধরণের অভ্যর্থনা পাবে সেটা মহাশ্বেতা আগে থেকেই ধারণা করে নিয়েছিল। কাকীমার এই অপ্রত্যাশিত সাদর সম্ভাষণে মহাশ্বেতা চমৎকৃত হয়ে পড়ল। মনে মনে তাঁর এই

আচরণ বৈচিত্র্যে সে খুসী হল। বাবুজীকে ইঙ্গিতে বাইরে দাঁড়াতে বলে মহাশ্বেতা বাড়ীর ভিতরে এলো।

—যুবনাশ্ববাবুকে দেখছি না কাকীমা?

বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিসহকারে কাকীমা বললেন, যুবনাশ্ব আবার কবে থেকে বাবু হল? অমন চালচুলোহীন বেকার বাউণ্ডুলে শিমূলফুল নিয়ে তোমার মত লক্ষ্মী পিতিমের কি হবে মা? তোমার আমি ভালো ছেলে দেবো। আমার কালো মাণিককে দেখেছ? ভূ-ভারতে অমন ছেলের জুড়ি আর তুমি খুঁজে পাবেনা মা। কালো মাণিক—ও বাবা কালো মাণিক—এই কেলো—

দাঁতে দাঁত দিয়ে কাকীমা চিৎকার করতেই কালোমাণিক ওরফে কেলো ঘর থেকে বার হয়ে এলো। মোষের মতো এক তাল কালো গোলাকার চলমান মাংসপিণ্ড। নাকটা নেপালীদের মতো থ্যাবড়ানো আর মুখটা সিফিলিস রুগীর মতো ভোঁতা। হোঁদল কুতকুতের মতো ছোট ছোট ঘোলাটে চোখের তারায় বিকৃত কামনার অলাতচক্র। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় ভোঁদা এবং ভোঁতা। গোবর গণেশ নিরেট গবেট।

কালো মাণিক বোকার মত মায়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই কাকীমা বিরক্তিভরা গলায় চিৎকার করলেন আবার: ও মলো, দেখছিস কি হ্যাঁ করে—নমস্কার কর দিদিমণিকে। ওঁর নজরে ধরলে তোর বরাৎ ফিরে যাবে।

কালোমাণিকের বুদ্ধি স্বভাবতই একটু কম। নির্বুদ্ধিতার প্রতিযোগিতা হলে সে যে বেশ ভালো রেজাল্ট করবে এ বিষয়ে তার শিক্ষকমহল একমত। কালোমাণিক তাড়াতাড়ি মায়ের আদেশমত মহাশ্বেতার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করতেই কাকীমা গর্জ্জে উঠলেন —বলি হারামজাদা, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? হাত তুলে নমস্কার করতে জানিস না? কাকীমা মহাশ্বেতার দিকে ফিরে কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তন করে আশ্চর্য্য মোলাম গলায় বললেন, আর বলনা মা,

মোটামোটা বই পড়ে ছেলের আমার মাথা খারাপ হবাব জোগাড়। এই আমার ছেলে কালোমাণিক। ভারী ভালো ছেলে মা। হিরের টুকরো। তুমি ওকে যা বলবে বাছা আমার তাই শুনবে; তোমার বাসি কাপড় ব্লাউস্ বড়িস সব ও কেচে দিতে পারবে—তোমার একটুও অবাধ্য হবে না। বাছা আমার অনেক নেকাপড়া করেছে।

কালো মাণিক এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় মহাশ্বেতা বেশ সঙ্কুচিত হয়ে সরে গিয়েছিল। এখন ব্যাপারটা সব বুঝতে পেরে মনে মনে তার মজাই লাগল। কাকীমা কালো মাণিকের বিদ্যাবত্তার মহিমা প্রচার করলে মহাশ্বেতা আর স্থির থাকতে না পেরে বলল, আপনার ছেলে বুঝি খুব বিদ্বান। আপনি কি পড়েন কালো মাণিকবাবু?

গম্ভীরমুখে কালোমাণিক বলল, this is my fourth attempt in the matriculation examination.

—ওই শোনো মা, আমার কালো মাণিক কেমন ঘটঘট্ গট্‌গট ইংজিরি বলে, যেন সায়েব বাচ্ছা। আর—

শিক্ষা, সভ্যতা আর সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে এমন মূর্তিমান অশিক্ষা থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায় না। মহাশ্বেতা কাকীমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না কাকীমা—আমি বুঝেছি আপনার পুত্র শ্রীমান কালো মাণিক অসীম গুণসম্পন্ন রত্নবিশেষ। কিন্তু ও কথা থাক, আমি এসেছিলাম যুবনাশ্ববাবু মানে যুবনাশ্বের কাছে—তিনি কোথায়?

কালোমাণিক মুখভাব অলৌকিক করে বলল, সে এখানে থাকে না—মা আর বাবা তুজনে মিলে তাকে ছাড়িয়ে তবে বেঁচেছে।

—কেলো হারামজাদা তুই এত বড় মিথ্যে কথা বললি—আমরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি?

বেগতিক দেখে কালো মাণিক সদর দরজা দিয়ে সরে পড়ল।

—যুবনাশ্বের ঠিকানা আমায় দিতে পারেন?

কাকীমা বেশ বুঝতে পারলেন যে তাঁর চাতুরী ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর কালোমাণিককে মহাশ্বেতার মনে ধরেনি। কাকীমা হুম্‌দাম করে রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, যমের বাড়ী গেছে সে— তার ঠিকানা পাবে নিমতলায়।

মহাশ্বেতা বাড়ী থেকে বার হয়ে এসে বাবাকে বলল, বাবুজী, চলে এসো, এখানে মিথ্যে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। বেশ বুঝিছি এরা সব যুবনাশ্বের শত্রু।

মনে মনে মহাশ্বেতা প্রতিজ্ঞা করল যুবনাশ্বকে খুঁজে সে বার করবেই।

## তেরো

ধীরে ধীরে যুবনাশ্ব তার নিজের কর্মজীবনের সঙ্গে তার জীবনাদর্শকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল। এখন আর শিয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে কাগজ বিক্রী করতে তার কষ্ট হয় না। কলেজমুখো ছেলেমেয়েদের দেখে হিংসায় চোখ ছুটো জ্বালা করে ওঠে না। রাত চারটে থেকে বেলা বারোটার মধ্যে কে কতো বেশী কাগজ বিক্রী করতে পারে তারই হার্ড্‌ল্ রেস চলে। তারপর অখণ্ড অবসর। যুবনাশ্ব ইতিমধ্যেই তার সহকর্মীদের মন জয় করে ফেলেছে। গোপালের বাড়ীতে ইতিমধ্যে সে ছুদিন নেমন্তন্নই খেয়ে এসেছে। কিন্তু রাম, গোপাল, সতীশ প্রভৃতি সহকর্মীদের পরিচয় সে যতই জানতে পারছে ততই ভীত হয়ে পড়ছে। একমাত্র গোপাল ছাড়া আর কারো পারিবারিক জীবন নেই। সবাই মেসে পড়ে থাকে, পোড়া বিড়ি কানে গুঁজে রেখে ছুবার করে খায়। সন্ধ্যায় তাস মানে, ফ্লাস। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে আর সপ্তায় ছুদিন করে পণ্যমূল্যে নারীমাংস কেনবার জন্যে চিৎপুর আর বৌবাজার অঞ্চলে যাতায়াত করে। নরমাংস বরমাংস। অনেক

রাত পর্য্যন্ত বেশ্যা আর নটি নিয়ে হৈ হুল্লোড় করে। এদের অনেকেরই সবকটা ম-কার দোষ আছে। আর এসব ব্যাপারের পরিণতি যা হয় এদের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় নি—ওদের প্রায় সবাই যৌন ব্যাধিতে ভুগছে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ডাক্তার বাড়ী যায়। এদের কাছ থেকে পালাবার জন্যে যুবনাশ্ব ছটফট করে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয়ে ওঠে না।

সেদিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। সন্ধ্যাবেলা বিছানায় বসে যুবনাশ্ব সুরঞ্জনাকে অভিযোগ জানিয়ে অভিমানভরা এক সুদীর্ঘ পত্র লিখল। কলকাতায় এসে সুরঞ্জনার কাছ থেকে সে একখানা চিঠিও পাইনি। মহাশ্বেতার চিন্তা যুবনাশ্বের অনেকখানি মন জুড়ে বসেছে। অস্বীকার করে লাভ নেই তার দুঃসাহসিকতা যুবনাশ্বকে আশ্চর্যভাবে আকর্ষণ করেছে। মহাশ্বেতা বলেছিল সে বালিগঞ্জে থাকে কিন্তু বালিগঞ্জ ছোট জায়গা নয়। ঠিকানা জানা থাকলে যুবনাশ্ব মহাশ্বেতার কাছে নিশ্চয়ই যেতো। সে কয়েকদিন বালিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিল যদি ভাগ্যক্রমে মহাশ্বেতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু হয়নি।

রাম এসে ঠেলা দিতেই যুবনাশ্বের চিন্তাজাল ছিঁড়ে গেল।

—কি খবর হিরো? এমন বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় হ্যারিসন রোডের মোড়ে দেখা কোন্ দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি মুখের কথা ভাবছ?

বাংলা ছবির নায়ক হবার উপযুক্ত চেহারা থাকায় সহকর্ম্মীরা যুবনাশ্বকে হিরো বলে ডাকত।

—কিছু ভাবছি না। যুবনাশ্ব মিথ্যাকথা বলল।

—নিশ্চয়ই কিছু ভাবছ বাবা! ভয় নেই, ভাগ বসাবো না। চল হিরো আজ একটু স্ফূর্তি করে আসা যাক।

যুবনাশ্ব বুঝতে না পেরে চোখ তুলে তাকালো যার অর্থ কোথায় যেতে বল।

—বড়ালগলি হে বড়ালগলি! মধুমিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দেবো—আরে না না তুমি যা ভাবছ ওসব কিছু না—কোনো ভয় নেই—একেবারে আনকোরা নতুন আমদানী—ভালো ঘরের মেয়ে ছিলো মাইরি, স্বামী মরে যাওয়ার পর এই পথে আসতে হয়েছে—মেয়েমানুষটির ব্যাভার খুব ভালো—টাকাকড়ি নিয়ে মোটেই গোলমাল করে না।

বাজারের পণ্যা মেয়েমানুষ মানে গতত্রপ কোট্টবী। কুলটা কুটনী! শিউরে উঠে যুবনাশ্ব প্রবলভাবে আপত্তি জানালো।

—ছিঃ ছিঃ রাম, তুমি ও সব কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবে না—আমি ওসব খারাপ পল্লীতে যাই না।

—প্রথম প্রথম সবাই ওই বুলি বলে চাঁদ, তারপর সবাই ওপথ মাড়ায়। খবরের কাগজ বিক্রী করে আয় কোনোদিনই তিন ডিজিটে দাঁড়াবে না—আর ওই টাকায় পাগল না হলে আজ কালকার দিনে কেউ বিয়ে করে না। বিয়ে করতে পারব না বলে ব্রম্ভচারী হয়েও তো থাকা যাবে না। সুতরাং মধুমিতার মধু খেয়েই আমাদের দিন কাটাতে হবে। আরে চল চল হিরো, মাধুর সঙ্গে আলাপ হলে দেখবে কেমন সুন্দর মেয়ে সে।

—রাম, দোহাই তোমার—তুমি যাও।

রাম কাঁধ shrug করে বলল, well, হিরো, যতদিন পারো good boy হয়েই থাকো—আমাদের মতো অগতির গতি মধুমিতা। বাড়ী নেই, গাড়ী নেই, সুন্দরী বউ নেই—মধুমিতা না থাকলে কিসের আকর্ষণে বেঁচে থাকব বাবা? গুডবায় হিরো।

বুভুক্ষু চাষা আর সমাজবঞ্চিত শ্রমিক যতদিন পৃথিবীতে থাকবে ততদিন মধুমিতার দলও থাকবে। আদিম মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তির নিঃসরণের সার্বজনীন নর্দ্দামা। এই প্রতিকূল পরিবেশে থেকে মনের সঙ্গে সংগ্রাম করে আর কতোদিন সে আর সংস্কৃতিবান অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে?

যথারীতি পরের দিন শিয়ালদা ষ্টেশনের মোড়ে দক্ষিণমুখ করে

দাঁড়িয়ে যুবনাশ্ব হাঁক ছিল।—যুগান্তর—ষ্টেটস্‌ম্যান—আনন্দবাজার—স্বাধীনতা—

যুবনাশ্বের অলক্ষ্যে তার পাশে একটা সুদৃশ্য ঝক্‌ঝকে মোটর এসে দাঁড়াল। সম্মুখে ষ্টেশান থেকে বেরুনো চলমান জনস্রোতের মাঝ থেকে যুবনাশ্ব খদ্দের খুঁজছিল। পাশ ফিরে তাকাবার মতো পর্য্যাপ্ত সময় তার নেই। মোটরের আরোহিনী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মৃদু গলায় বলল, দেখি একটা অমৃতবাজার।

অভ্যস্ত হাতে পত্রিকাটি নিয়ে ক্রেতার দিকে চোখ তুলতেই যুবনাশ্ব চম্‌কে উঠল। অস্ফুটস্বরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মহাশ্বেতা!

মহাশ্বেতা মিটিমিটি হাসিতে উজ্জ্বল হল।

—হ্যাঁ আমি! উঃ কি দুষ্টু ছেলে তুমি যুবনাশ্ব! সারা কোলকাতা আমি তোমার জন্যে তন্নতন্ন করে খুঁজছি আর তুমি এখানে! গাড়ীতে ওঠো। মহশ্বেতা জানে না কখন অন্তরঙ্গতায় সে অনেক কাছে এসে গেছে। আপনি থেকে তুমি!

—কিন্তু এখনো অনেক কাগজ রয়েছে বিক্রী করবার—

—কতো কাগজ আছে?

—খান ত্রিশেক হবে।

—আচ্ছা, আমি সব কিনে নেবো—সময় নষ্ট কর না—তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে এসো। মহাশ্বেতা সব সমস্যার সমাধান করে দিল।

যুবনাশ্বের মনেও মহাশ্বেতার আসঙ্গলিপ্সা জেগে উঠেছে। মহাশ্বেতার এই স্নেহশাসন সে অমান্য করতে পারল না। সৌন্দর্য্যের কায়া আর মমতার মায়ায় সে বন্দী হল। যুবনাশ্বকে মহাশ্বেতার সঙ্গে কথা বলতে দেখে অন্য সব পরিচিত হকাররা উৎকর্ণ হয়ে কথাবার্ত্তা শুনছিল। তাদের চোখমুখে ভদ্রমহিলা দেখার ব্যাকুলতা। যুবনাশ্বকে মোটরে উঠতে দেখে একজন টিপ্পনি কাটল

হিরো মোটরওয়ালী বাগিয়েছে—আমাদের একটা সাইকেল ওয়ালীও জোটে না—জোর বরাত হিরো!

মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল, তুমি রাগ করলে না তো যুবনাশ্ব?

—রাগ করব কেন? কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?

—আমাদের বাড়ী—

ভীতকণ্ঠে যুবনাশ্ব বলল, আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে কি করব?

—বারে, আমার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে হবে না? দেখবে আমার বাবুজী কতো ভালো লোক!

যুবনাশ্ব অপরাধীসুলভ কুণ্ঠিত গলায় বলল, কিন্তু তোমার বাবা যখন জানতে পারবেন যে আমি একজন রাস্তার ফেরীওয়ালা তখন তিনি আমাকে—

—ঘৃণা করবেন এই ভাবছ তো? বাবুজী মোটেই ঘৃণা করবেন না। উল্টে তোমায় বেশী করে ভালবাসবেন। আমাদের একটি কটন মিল, তুটো মোটর আর তিনখানা বাড়ী দেখে ভেবো না যে চিরকালই আমাদের এমন অবস্থা ছিল। এইসব কিছুই বাবুজীর অতন্দ্র সাধনা আর অসীম কর্মদক্ষতার পুরস্কার। জানো যুবনাশ্ব, মজার ব্যাপার যে বাবুজীও started his career as a peddler like you. মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের হাতটা তার তুহাতের মধ্যে নিয়ে খেলা করতে থাকে। মহাশ্বেতার সহানুভূতি আর সপ্রেম ব্যবহারে যুবনাশ্ব মুগ্ধ হয়ে গেল।

—তুমি কি করে জানলে মহাশ্বেতা যে আমি শিয়ালদা ষ্টেশানে কাগজ বিক্রী করি?

—সে এক বাণ্ডিল কথা। তোমার সঙ্গে সেদিন তোমার কাকার বাড়ী গিয়েছিলাম, তার পরের দিন বাবুজীকে নিয়ে ওখানে গেলাম। তোমার কাকীমার কাছে শুনলাম তুমি ওখানে থেকে

চলে গেছ আর তোমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে উনি আমায় নিমতলার ঘাটে যেতে বললেন। মহাশ্বেতা হাসতে হাসতে যুবনাশ্বের গায়ে গড়িয়ে পড়ে বলল, জানো যুবনাশ্ব তোমার রত্নগর্ভা কাকীমা তাঁর রত্ন কালোমানিকের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাড়লেন। কালো মানিকের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি কতো সুখী হব তোমার কাকীমা সবিস্তারে সে সব কথা বললেন। কালো মানিক হিরের টুকরো ছেলে। সে আমার ফরমাস খাটবে, মাথার যন্ত্রণা হলে মাথা টিপে দেবে, আমার কাপড় কেচে দেবে, দরকার হলে পদ সেবাও করবে। হাসি থামিয়ে সিরিয়াস হয়ে মহাশ্বেতা বলল, গতকাল কলেজস্ট্রীটে কালোমানিকের সঙ্গে দেখা হল। তার কাছে তোমার পেশা এবং whereabouts জানতে পারলাম। এই যে আমরা এসে গেছি।

একটি সুদৃশ্য অট্টালিকার সৌখীন গাড়ীবারান্দার ভিতর মোটর এসে দাঁড়াল। মহাশ্বেতা বাবুজীর সঙ্গে যুবনাশ্বের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিল। যুবনাশ্বের অমায়িক ব্যবহারে বীরেনবাবু মুগ্ধ হলেন। ছেলেটিকে তাঁর মনে ধরল। বাবুজীর সঙ্গে আলাপ শেষে মহাশ্বেতা যুবনাশ্বকে তার প্যারালিসিসে শয্যাশায়ী মায়ের ঘরে নিয়ে গেল। এই দীর্ঘদেহী সুদর্শন ছেলেটির কথায়বার্ত্তায় মায়ের ভারী ভালো লাগল। পুত্রসন্তানহীন বুভুক্ষু মাতৃত্ব মাথা চাড়া দিল। মহাশ্বেতার দিকে ফিরে বললেন, তোর পছন্দর সত্যই প্রশংসা করতে হয় খুকী। খাসা ছেলে!

মহাশ্বেতা মুখে তর্জ্জন তুলে মাকে বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে বলল, চুপ কর মা, ভালো হবেনা বলছি।

মা যুবনাশ্বের দিকে চেয়ে বললেন, দেখো যুবনাশ্ব, যা শুনলাম, তাতে তোমায় আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই—তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাকো—না না কিন্তু না—মহাশ্বেতা আমার একমাত্র সন্তান। আমার সব কিছুরই উত্তরাধীকারী মহাশ্বেতা—মানে

তোমরা। তুমি এবাড়ীতে আমার ছেলের মতোই থাকবে—ওঁর ব্যবসা দেখাশুনো করবে—তারপর সময় হলেই তোমাদের দু'হাত এক করে দেবো।

—মা তোমাদের ওসব কথা পরে হবে—কফি তৈরী হয়ে গেছে

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মা যুবনাশ্বকে নিয়ে তুই যা –

—এই, এসো। মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের হাতে টান দিল।

## ( চৌদ্দ )

যুবনাশ্ব মহার্শ্বেতাদের বাড়ীতেই থেকে গেল। বীরেনবাবু এতো তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা পাকা করে ফেলতে চাননা। গরীবের ছেলে—আত্মীয় স্বজন তেমন কেউ নেই, বংশগৌরব কিছু নেই—এমন ছেলের স্বভাব চরিত্র কেমন হবে কে বলতে পারে? কিছুদিন কাছে রেখে যাচিয়ে নেওয়া যাক আর এই সময়ের মধ্যে দুজনে দুজনকে ভালোভাবে চিনুক। বীরেনবাবু যুবনাশ্বকে তাঁর ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার করে দিয়েছেন। যুবনাশ্বের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং অনন্যসাধারণ অধ্যাবসায়গুণে এই সামান্য সময়ের মধ্যেই উৎপাদন বিক্রয় এবং মুনাফা অনেক বেড়ে গেছে। এমন একটি উপযুক্ত ছেলের হাতে কন্যাকে এবং তাঁর অবর্ত্তমানে নিজের রক্ত দিয়ে গড়া ব্যবসায় দিয়ে যাবার কথা ভেবে তৃপ্তি এবং স্বস্তিতে তাঁর দুচোখ বুজে আসে।

কাজ সেরে যুবনাশ্ব সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরে আসে। কোনো কোনদিন কলেজফেরতা মহাশ্বেতা ফ্যাক্টরী থেকে যুবনাশ্বকে নিয়ে বাড়ী ফেরে। সে আগে ফিরলে ড্রয়িংরুমে যুবনাশ্বের ফেরবার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। যুবনাশ্বের ফিরতে সামান্য কয়েক মিনিট দেরী হলেই কৈফিয়ৎ তলব করে বসে। শাসনের তর্জনী তুলে

কাছে এগিয়ে এসে বলে, আজ এত দেরী হল কেন শুনি ? মহাশ্বেতার একটি শুভ্র হাত দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে যুবনাশ্ব বলে, মোটেই দেরী হয়নি। আমার পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দেবে তোমার রোলেক্স রিস্টওয়াচ। ওকে জিজ্ঞাসা কর, ও বলবে পাঁচটা বেজে মাত্র ত্রিশ হয়েছে।

—ত্রিশই বা হবে কেন শুনি ? অফিস থেকে বার হবার কথা পাঁচটায় আর 'কারে' করে ফিরতে কুড়ি মিনিট—অর্থাৎ তোমার দশমিনিট লেট।

—এখন থেকেই এতো কঠিন শাসন ?

যুবনাশ্বের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে মহাশ্বেতা বলল, আচ্ছা, আজও তুমি কাপড় পরে ফ্যাক্টরী গিয়েছিলে ? তোমাকে না পই পই করে বলি স্যুট পরবে—আমার একটি কথাও তুমি শোনোনা।

—কানমলা খাচ্ছি আর তোমার অবাধ্য হবনা। চল, লেকের হাওয়া খেয়ে আসা যাক—আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ready হয়ে নিচ্ছি।

—না, আজ আর বেড়ানো নয়। আজ তোমার সঙ্গে ব্যাড়মিণ্টন খেলব।

—কিন্তু আমি খেলতে ভালো জানিনা।

—যা জানো তাতেই হবে।

—তোমার কাছে নির্ঘাৎ হেরে যাবো।

স্বপ্ন-গভীর নীল চোখে বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে কুহকিনী নারীর মোহ ছড়িয়ে মহাশ্বেতা বলল, আমার কাছে হারলে তোমার লজ্জা হবার কথা নয়। আমার কাছে হেরেই তো তোমার জিৎ। মহাশ্বেতা সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, এই, দেরী হয়ে যাচ্ছে, মা যে তার ছেলের জন্যে বিছানায় শুয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করছে।

—হ্যাঁ, মহাশ্বেতা, যাই।

খেলা শেষ করে জ্যোৎস্নালোকিত লনে যুবনাশ্বের পিঠে হেলান দিয়ে একাশি হয়ে বসে মহাশ্বেতা কথা বলছিল।

—অমন করে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছ যুবনাশ্ব ?

—তোমায়—তোমার অপরূপ রূপ।

—অমন করে একদৃষ্টে এতক্ষণ ধরে দেখবার কি আছে ?

—সৌন্দর্য্য-সিসৃক্ষু-মনন বোধহয় ভগবান মেয়েদের দেননি তাই এমন কথা বল। জনম অবধি কবি রূপ দেখেছেন তবুও নয়ন না তিরপিত ভেল।

মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে-বলল, দুষ্ট ছেলে কোথাকার—কেবল দুষ্টুমি! আচ্ছা যুবনাশ্ব, আমাদের পরিচয় কেমন নাটকীয়, তাই না।

—হ্যাঁ, নাটকনভেলেও এমন হয়না। তুমি তো মহাশ্বেতা আমার সব কিছু জাননা, ধর আজ যদি তুমি জানতে পার যে আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছি এতোদিন—মানে আমি বিবাহিত—এ খবর শুনলে তোমার মনের অবস্থা কেমন হবে ?

—ইস্, আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে! আমি অতো ভীতু নই মশাই। তোমার কাকীমার কাছ থেকে সব খবর খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তোমার বিয়ে হয়েছে কিনা। উত্তরে উনি বললেন, বিয়ে ? ক্ষেপেছ ? চাল নেই চুলো নেই, এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, ওই শিমুলফুলকে কে বিয়ে করবে ? ভাগ্যিস মহাশ্বেতা রায় ছিল, তা না হলে শিমূলফুলের কি গতি হত বল দিকি ? মহাশ্বেতা হেসে যুবনাশ্বের গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল।

—মিথ্যা নয় মহাশ্বেতা।

—তোমার কাকীমা বুঝি তোমায় দেখতে পারেন না যুবনাশ্ব ?

—দেখতে পারবার তো কথা নয় মহাশ্বেতা। আমি ওদের স্বল্প

আয়ের উপর ভাগ বসাচ্ছিলাম—উপকার না করে অপকার করছিলাম। কেন তারা আমায় ভালবাসবে বল?

মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের বুকে মাথা ঘস্‌তে ঘস্‌তে তৃষিত কণ্ঠে বলল, আমি তোমায় ভালবাসি যুবনাশ্ব।

—সে জন্যেই তো আমার ভয় মহাশ্বেতা। না চাইতেই তোমার কাছ থেকে এতো কিছু পেলাম, পরে যখন ক্লান্ত পথিকের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে তোমার কাছে যাবো, তখন হয়তো দেখব তুমি মায়া-মৃগের মতো আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছ। ধরা দিয়েও অধরা থেকে যাচ্ছ।

—ওই সব খারাপ খারাপ কথা বলে ভয় দেখালে ভালো হবেনা বলছি। এই পৃথিবীতে কারো ক্ষমতা নেই আমার বুক থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেয়।

মহাশ্বেতার গলায় সুরঞ্জনার কথার প্রতিধ্বনি শুনে যুবনাশ্ব চম্‌কে উঠল। সুরঞ্জনাও না ঠিক এমনভাবে কথা বলত? একটা চরম অস্বোস্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আম্‌তা আমতা করে যুবনাশ্ব বলেই ফেলল, জানো মহাশ্বেতা, সুরঞ্জনা নামে আমাদের পাড়ায় একটি মেয়ে ছিল।

—বেশ তো। নির্বিকার অম্লানমুখে মহাশ্বেতা বলল।

—ছোটবেলায় আমি—আমি—

—সব বুঝে গেছি, আর বলতে হবেনা বাল্য প্রণয়লীলা। প্রতাপ শৈবলিনী, দেবদাস-পার্বতীজাতীয় ঘটিত ব্যাপার। তারপর তোমার সেই বাল্য প্রণয়িনীর সঙ্গে পরিণয় হল এক মধ্য বয়সী ভদ্রলোকের—এই তো তোমার কাহিনীর উপসংহার?

যুবনাশ্বের মুখ দিয়ে ফস্‌ করে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ।

—যাক, তাহলে সে সব চুকে বুকে গেছে।

অপরাধীসুলভ দ্বিধাকণ্ঠে যুবনাশ্ব বলল, কিন্তু সে আমায় ভালবাসে মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের কথায় কোনো গুরুত্ব আরোপ না করে বলল, চেহারাটা যা করেছ তাতে চার অক্ষরের ওই ভ-পূর্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ অনেক মেয়ের কাছ থেকেই পাবে।

—কিন্তু আমিও যে তাকে ভালবাসি মহাশ্বেতা।

—আর আমাকে বুঝি ভালবাসো না? মহাশ্বেতা মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো।

—তোমার মতো এমন প্রীতি-স্নিগ্ধ জীবন্ত মিষ্টি মেয়েকে কে ভাল না বেসে থাকতে পারবে? তোমাকে ভালবেসেই তো আমি ধন্য মহাশ্বেতা।

—সুরঞ্জনা এবং মহাশ্বেতার মধ্যে ভালবাসার প্রপোরসান কি?

—আপাততঃ ফিপ্‌টি ফিপ্‌টি। যুবনাশ্ব মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল হল।

—শীঘ্রই আমি ওই প্রপোরসান নাইনটি আর টেনে দাঁড় করিয়ে ফেলব।

—তুমি একটা গান গাও মহাশ্বেতা। যুবনাশ্ব অপ্রিয় আলোচনা থেকে মুক্তি খুঁজল।

—তার আগে তুমি একটা গান গাও। যুবনাশ্ব গান গায় একথা মহাশ্বেতা আগেই জেনে নিয়েছে।

—উঁ-হুঁ—গান না—একটা কবিতা—কবির কথা হয়ত বা আমারও মনের কথা। মহাশ্বেতা তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল আর যুবনাশ্ব মধুর গলায় আবৃত্তি করে চলল

'ওগো গরবিনী, সত্রে তোমার
যত উপবাসী নিত্য জুটে,
আমি তো তাদের একজন নই
চাবোনা ভিক্ষা চরণে লুটে।

তা বলে ভেবো না ক্ষুধা নেই মম,
জানি না অভাব নিষ্ঠুরতম,
আশা নিরাশার দোদুল দোলায়
নামিনি পাতালে, উঠিনি কূটে,
প্রতিদানহীন দান নিতে তবু
আসিনি লোভীর সঙ্গে জুটে।'

সহসা একদিন যুবনাশ্বের মনে দুষ্টুবুদ্ধি গজালো। মহাশ্বেতাকে একটু ভয় দেখাতে হবে। সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে যুবনাশ্ব মহাশ্বেতাকে তার ঘরে নিয়ে এলো।

—আচ্ছা মহাশ্বেতা, তুমি তো রোজই বল, তুমি আমাকে কতো গভীর ভাবে ভালবাসো। ভালবাসা মানেই sacrifice তুমি আমার জন্যে কি sacrifice করতে পার?

—সব করতে পারি। মহাশ্বেতা সহজ গলায় বলল।

—ইস্—

--সন্দেহ হলে পরীক্ষা কর।

—বেশ তো দেখাই যাক। তাক্ থেকে একটা বোতল এনে টেবিলে মহাশ্বেতার সামনে বসিয়ে দিয়ে যুবনাশ্ব বলল, মাঝে মাঝে একটু ড্রিংক করি। বুঝলে মহাশ্বেতা? আজ আমরা দুজনে এক সঙ্গে ড্রিংক করব।

চম্‌কে উঠল মহাশ্বেতা।

—ভয় পেয়ে গেলে যে বড়? এই না বললে তুমি আমায় গভীরভাবে, ভালবাসো—আমার জন্যে সব করতে পার—সামান্য একটু মদ তাও খেতে পারবে না?

—তোমার এগুণ আছে আমার জানা ছিল না যুবনাশ্ব। নিদারুণ ব্যথায় নীল হয়ে গেল মহাশ্বেতা।

—আমাকে আনন্দ দেবার জন্যে একটু মদ না হয় খেলেই?

পারবে না তুমি মহাশ্বেতা? যুবনাশ্বের মিনতি বিগলিত কামনা বিচলিত কণ্ঠে অনুরোধ ঝরে পড়ল।

অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে মহাশ্বেতা ভাবল। আস্তে আস্তে থেমে থেমে বলল, আমি ড্রিংক করলে তুমি যদি খুসী হও—তাই হোক—আমি—আমি খাবো—তুমি দাও—

—Good girl! এই তো চাই! এই নাও। যুবনাশ্ব এক পেয়ালা লোহিতবর্ণ তরল পানীয় মহাশ্বেতার দিকে এগিয়ে দিল।

—কি ভাবছ—দেরী করছ কেন—খাও—

মহাশ্বেতা চোখ বুজে মুখ বিকৃত করে এক চুমুক খেয়েই ফেলল।

হো হো করে যুবনাশ্ব হেসে ঘর ফাটিয়ে ফেলল।

—কি খেলে? মদ? আরে ও অরেঞ্জীতা—কি বোকা মেয়ে—কেমন মজা হল!

মহাশ্বেতা তীব্র ক্রোধের সঙ্গে যুবনাশ্বের চুল-মুখ খামচে দিয়ে বলল, অসভ্য, ইতর, ছোটলোক! এমন করে মজা দেখিয়ে ভয় দেখানো তোমার আমি বার করে দেবো। উঃ, আমার কি ভয়ই হয়েছিল!

হারানিধি ফিরে পাওয়ার পরম স্বস্তিতে মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের বুকে তার মাথা এলিয়ে দিল।

ফ্যাক্টরীতে যাবার জন্যে যুবনাশ্ব বার হচ্ছিল। মহাশ্বেতা তার সামনে এসে দাঁড়াল। টাই-এ নট দিতে দিতে বলল,—এই, আজ তিনটেয় ফিরবে। আমাদের কলেজের এক সুন্দরী বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো।

—সুন্দরী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে তোমার সাহস হবে?

—হবে না কেন শুনি? আমার জিনিষের দিকে নজর দিলে তার চোখ গেলে দেবো না?

চমকে উঠল যুবনাশ্ব। ঠিক এমন ভাবেই সুরঞ্জনা কথা বলত

না? যুবনাশ্ব সরে এসে মহাশ্বেতার বিশাল খোঁপাটি খুলে দিল। একমাথা কোঁকড়ানো কালো চুল সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়ল।

—আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয় না মহাশ্বেতা?

মুখ তুলে একান্ত নির্ভয়ে মহাশ্বেতা বলল, তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব যুবনাশ্ব?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই—দেরী হয়ে যাচ্ছে—চলি কেমন? যুবনাশ্ব অস্বস্তি অনুভব করে। সে পালাতে চায়।

—এসো।

মহাশ্বেতার তাগিদের কথা মনে থাকায় যুবনাশ্ব সেদিন সকাল সকালই ফ্যাক্টরী থেকে ফিরল। মহাশ্বেতা অবশ্য তখনো আসেনি। কিছুক্ষণ পরেই মোরাম বিছানো পথ দিয়ে গাড়ীবারান্দায় ট্যাক্সী এসে থামার শব্দ শোনা গেল। প্রত্যুদগমনের জন্যে যুবনাশ্ব দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। গাড়ী থেকে নামতে নামতে মহাশ্বেতা দুষ্টুমেয়ের মতো সাহেবী কায়দায় তার হাতটা মুখের কাছে এনে যুবনাশ্বের উদ্দেশ্যে একটা চুমো ছুঁড়ে দিল।

—এসো সুশোভনা, নামো। মহাশ্বেতার কথামতো সুশোভনা মোটার থেকে নামল। যুবনাশ্বের উপর চোখ পড়তেই সে ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে চমকে উঠল। যুবনাশ্বও অপ্রত্যাশিতভাবে সুশোভনাকে দেখে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি ব্যাপার, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লে কেন সুশোভনা? এসো যুবনাশ্বের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। ওকি অমন হ্যাঁ করে চেয়ে আছো কেন? তুমি যুবনাশ্বকে চেনো নাকি?

সুশোভনা স্বপ্নোত্থিতের মত বলল, এ্যাঁ—হ্যাঁ—না—

—পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের। ইনি হচ্ছেন শ্রীমান যুবনাশ্ব লাহিড়ী—বাবার ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার। আমি ওর কে হই সেটা বরং ওকেই জিজ্ঞাসা, কর। যুবনাশ্ব, এই ভদ্রমহিলা হচ্ছেন আমার নবলব্ধ ক্লাসফ্রেণ্ড শ্রীমতী সুশোভনা ব্যানার্জী।

যুবনাশ্ব বেকুব ভাবখানা কাটিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, নমস্কার সুশোভনা দেবী।

সুশোভনা যুবনাশ্বকে প্রতিনমস্কার জানাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। মহাশ্বেতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, চল মহাশ্বেতা।

যুবনাশ্বের প্রতি সুশোভনার তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা মহাশ্বেতার দৃষ্টি এড়ালো না। তার প্রিয়জনকে অপমান করায় মনে মনে সে মর্মাহত হল।

—মহাশ্বেতা, তুমি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ কর—তাড়াতাড়িতে cash book আনতে ভুলে গেছি—সেটা একবার চেক করা দরকার—আমি একবার ফ্যাক্টরী থেকে ঘুরে আসছি।

ওদের কাউকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কারো বুঝতে বাকী রইল না যে এটা ফাঁকির জন্যে ফিকির খোঁজার একটা অছিলা মাত্র। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হাই তুলতে তুলতে তাচ্ছিল্য গলায় সুশোভনা বলল, মহাশ্বেতা ওই ছোকরাটিকে জোটালে কোথা থেকে?

মহাশ্বেতা ব্যথিতকণ্ঠে বলল, সুশোভনা, তুমি আমার বন্ধু এবং নিমন্ত্রিত অতিথি। আমি আশা করিনি তুমি আমার ভালবাসার পাত্রকে এমনভাবে অপমান করবে।

সুশোভনা কৌচের উপর খাড়া হয়ে উঠল।

—তুমি ওই ছেলেটির সত্যকার পরিচয় জানো মহাশ্বেতা?

—কেন জানব না? হুগলীতে ওর বাড়ী—বাবা মা আত্মীয় স্বজন বলতে তিনকুলে ওর কেউ নেই—কতলকাতায় এসে শিয়ালদার মোড়ে খবরের কাগজ ফেরি করত—সব কথাই যুবনাশ্ব বলছে।

—কিন্তু আরো অনেক কথা আছে যা ও তোমায় বলেনি।

—মানে—মানে—তুমি যুবনাশ্বকে চেনো?

—What do you mean by চেনো ? I know the fellow better than you do. He is wicked to the backbone—a hypocrite—scoundrel—rascal—খেতে না পেয়ে ফ্যা ফ্যা করে নেড়ী কুত্তার মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল দেখে বাবা ওকে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম আমায় একা পেয়ে অপমান করতে আসে। ভাগ্যিস্ সেই সময় চাকরটা ঘরে এসে পড়ে তা না হলে কি যে হোত সেটা ভাবতেও ভয় পাই। সেদিনই বাবা ওকে জুতো মেরে বাড়ীথেকে বার করে দেয়। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি মহাশ্বেতা কি করে তুমি অমন একটি দুশ্চরিত্র বজ্জাত ছেলেকে তোমার প্রেমিক নির্বাচন করলে। বুঝিছি চেহারা দেখে ভুলেছ। ওকে এখনই গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

—তুমি কি যা তা বলছ সুশোভনা—তুমি নিশ্চয়ই অন্য কোনো ছেলের কথা বলছ—আমার যুবনাশ্ব কখনোই অমন হতে পারে না। তুমি জানোনা যুবনাশ্ব কতো ভালো ছেলে। সে চরিত্রবান, সত্যবাদী, সংযমী—তোমার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে সুশোভনা।

ধারালো হাসি হেসে সুশোভনা বলল, প্রেম তোমার অন্ধ করে দিয়েছে মহাশ্বেতা। ভুল আমার এতটুকুও হয়নি। মিথ্যে মিথ্যে একজনের চরিত্রে blame দিয়ে আমার কিছু ব্যক্তিগত লাভ আছে কি ? বন্ধু বলেই শুধু তোমায় সাবধান কার দিতে চাই মহাশ্বেতা—তুমি ওর ফাঁদে পা দিও না। তোমার বাবার সম্পত্তি একবার হাত করতে পারলে ও নিজমূর্ত্তি ধারণ করবে—ছেঁড়া জুতোর মতো তোমায় ফেলে দেবে। ওর মধ্যে যদি guilty conscience না থাকত তাহলে cash book দেখবার অজুহাতে এমন করে আমার সামনে থেকে পালিয়ে যেতো না। যাক্, চললাম মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতা পাষাণের মতো নির্বাক। মৃত্যুর মতো নিশ্চল,

নিশ্চুপ। ভদ্রতার খাতিরে সুশোভনাকে গাড়ীতে তুলে দেওয়ার কথাও সে ভুলে গেল।

রাত্রি দশটার সময় যুবনাশ্ব উদভ্রান্তের মতো ফিরে এলো। তারই অপেক্ষায় মহাশ্বেতা বারান্দার থামের পিছনে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কড়িডোর দিয়ে নিঃশব্দপায়ে পলাতক আসামীর মতো যুবনাশ্ব তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

—দাঁড়াও যুবনাশ্ব।

মহাশ্বেতা সামনে এসে দাঁড়ালো। যুবনাশ্ব চম্‌কে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—মহাশ্বেতা—তুমি—তুমি—অনেক রাত হয়ে গেছে মহাশ্বেতা, তুমি শুতে যাওনি?

—না। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

—অনেক রাত হয়ে গেছে মহাশ্বেতা—এখন তুমি ঘুমাওগে যাও, কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে।

অবিচলিতকণ্ঠে মহাশ্বেতা বলল, না, কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার মতো ধৈর্য্য আমার নেই। আমার কতকগুলো প্রশ্নের জবাব আমি চাই।

—তুমি শুধু আজকার রাতটুকু অপেক্ষা করতে পার না মহাশ্বেতা?

—না।

—কি তোমার প্রশ্ন মহাশ্বেতা?

—তুমি সুশোভনাকে চেনো?

—চিনি মহাশ্বেতা।

—তুমি সেকথা তখন চেপে গিয়েছিলে কেন?

—চেপে তো যাইনি—তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করনি বলেই—বলিনি।

—তুমি কিছুদিন ওদের বাড়ীতে আশ্রিত হয়ে ছিলে?

—ছিলাম মহাশ্বেতা।

—সুশোভনা তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছিল ?

—মিথ্যা নয় সেকথা।

—তাহলে সুশোভনা যা বলেঃ সবই দেখছি সত্যি।

—কি তোমায় সুশোভনা বলেছে মহাশ্বেতা ?

—যা সত্যি তাই বলেছে। তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল—দুশ্চরিত্র—বদম্‌াস—

—আমার কথা না শুনে শুধুই এক তরফা গালিগালাজ করে চলবে তুমি ?

—তোমার মতো মিথ্যাবাদী ভণ্ডর কাছ থেকে কোনো কথা শোনবার প্রয়োজন আমার নেই—কাল সকালে উঠে যেন তোমার মুখদর্শন করতে না হয়। The sooner you leave the better for me. দুধকলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষতে রাজী নই।

যুবনাশ্ব অনেকক্ষণ মহাশ্বেতার দিকে তাকিয়ে রইল। অস্ফুটস্বরে বলল; তুমি যদি চাও, তাই হবে মহাশ্বেতা। শংকামন্থর স্খলিত পায়ে যুবনাশ্ব তার ঘরে ফিরে এলো। ঘরে ফিরে হতাশ ভাবে বিছানায় বসে পড়ল। সুশোভনা তার নামে মহাশ্বেতাকে কি বলেছে সে জানেনা। কিন্তু এটা সে বুঝেছে যে সুশোভনা তার কানে বিষ ঢেলেছে। সে তো সুশোভনার কোনো ক্ষতি করেনি কিন্তু কেন তার প্রতি সুশোভনার এই প্রতিহিংসা ? সহসা মনে হল সুশোভনা ভালই করেছে। আঘাত দিয়ে সে তার মগ্নচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। এই তিনমাস ধরে সে শুধু মহাশ্বেতার কথাই ভেবেছে। স্মৃতিরঅরণ্য-গভীরে সুরঞ্জনা আজ অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। মহাশ্বেতাকে পেয়ে সে তার এতোদিনের বনলতা বাল্য-প্রণয়িনীকে ভুলে গিয়ে একটা বিরাট অপরাধ করতে যাচ্ছিল। কঠিন-কঠোর ভীষণ-ভয়াল তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতের তার প্রয়োজন ছিল—ভালোই হয়েছে সুশোভনা তাকে আঘাত দিয়েছে। এ কথা সত্যি সুরঞ্জনা

তার একটা চিঠিরও জবাব দেয়নি কিন্তু কলকাতা থেকে হুগলীর দূরত্ব এমন কিছু নয়—গিয়েই বা যুবনাশ্ব কেন তার খোঁজ করল না? সুশোভনা তার সম্বন্ধে মহাশ্বেতাকে এমন কি কদর্য্য কথা বলেছে যার জন্যে মহাশ্বেতার মতো প্রতিঘাতসহিষ্ণু মেয়েও ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। মহাশ্বেতা তার মত কুলাঙ্গারের মুখদর্শন করতে চায় না এ কথা মুখ ফুটেই সে বলেছে। শুধু বলেছে নয়, শক্তির দম্ভে আদেশ জানিয়েছে যুবনাশ্ব চলেই যাবে। সে চলে যাবে। সে চলে যাবে সুরঞ্জনার কাছে। তার অস্থি মজ্জা আর সংস্কার দিয়ে তৈরী সুরঞ্জনা। তার আত্মার আত্মীয়। সকাল হবার আগেই সে বিলাসের পাষাণ প্রাসাদ ত্যাগ করবে। আবার শিয়ালদার সেই চেনা ফুটপাত। আবার গলা ফাটিয়ে সংগ্রামী মানুষের জীবিকার শ্লোগান। কিন্তু যাবার আগে মহাশ্বেতার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়া দরকার। জানিয়ে যাবে সে সত্যই তার সঙ্গে প্রতারণা করেনি। ঘড়ির মসৃন ডায়ালে সময়ের কাঁটা ঘুরে চলেছে। রাত একটা। যুবনাশ্ব মহাশ্বেতার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে, বোধ হয় মহাশ্বেতা ঘুমোতে পারেনি। যুবনাশ্ব দরজার কাছে এসে টোকা দিয়ে ডাকল, মহাশ্বেতা—মহাশ্বেতা—

বেশ কয়েকবার ডাকাডাকির পর বিরক্তিভরা গলায় মহাশ্বেতা সাড়া দিল: আঃ, এতোরাত্রে ডাকাডাকি কেন? ঘুমোতেও দেবেনা শান্তিতে?

—কিন্তু তুমি ঘুমোচ্ছ বলেও তো মনে হয় না মহাশ্বেতা। দরজা না খুলেই মহাশ্বেতা বলল, বাজে না বকিয়ে কি চাও বল?

—তুমি দরজা খুলবেনা মহাশ্বেতা? আমি কিছু চাইনা—শুধু যাবার আগে একবার দুচোখ ভরে তোমার কঠিন মূর্ত্তিটা দেখতে চাই, মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতা বুঝি এবার আছড়ে পড়বে মাটিতে। মনে মনে কেঁদে

উঠল, ওগো অমনকরে তুমি আমায় ডেকো না। কাঁদন দিয়ে বাঁধন পরিওনা। এক্ষুনি বুঝি মহাশ্বেতা দরজা খুলে যুবনাশ্বের বুকের উপর ভেঙ্গে পড়বে। অবরুদ্ধ অশ্রুপ্লাবনের বন্যায় তার স্বতন্ত্র সত্ত্বা বুঝি ভেসে যাবে। কিন্তু খাটের পায়া ধরে, ঠোঁটে দাঁত চেপে সমস্ত শক্তিকে সংহত করে সংযত হল মহাশ্বেতা। নিজের দুর্বলতা সে কিছুতেই দেখাবে না তাই সে দরজা খুলল না। কোনো উত্তরও দিল না।

—মহাশ্বেতা, তুমি আমায় এতো ঘৃণা কর এ আমি জানতাম না —চললাম আমি—জীবনের রঙ্গমঞ্চে আর হয়তো কোনোদিনই তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না—তুমি আমায় ঘৃণা কর ক্ষতি নেই, কিন্তু লক্ষ্মীসোনা আমার—তুমি আমায় ভুল বুঝোনা, এই শুধু আমার মিনতি—বিদায় মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতা বুঝি পাষাণ হয়ে গেছে। অনেক্ষণ পরে সহসা যেন তার চেতনা ফিরে এলো। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখল যুবনাশ্ব চলেগেছে। পাগলের মতো মহাশ্বেতা ছুটে গেল যুবনাশ্বের ঘরে। সেখানেও যুবনাশ্ব নেই। সে চলে গেছে।

—যুবনাশ্ব—যুবনাশ্ব—আমার দুষ্টুসোনা ফিরে এসো তুমি—তুমি না থাকলে আমি যে পাগল হয়ে যাবো—

পাষাণপ্রাচীরের কঠিন কপাটে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি ভৌতিক হয়ে উঠল।

লক্ষ্যভ্রষ্ট নিশাচর মাতালের মতো যুবনাশ্ব পার্কে এসে বসেছিল। সেখান থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে খেতে শিয়ালদা ষ্টেশনের কাছে এসে যখন পৌঁছল তখন পূর্বদিগন্ত আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যুবনাশ্বকে দেখে রাম মন্তব্য করল, কি খবর হিরো? হিরোইন ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে তো?

—ভদ্দরলোকের মেয়ে তোমাকে নিয়ে সখ মিটিয়ে নিয়েছে তো? মুচকী হেসে চুট্‌কী ঝাড়ল গোপাল।

যুবনাশ্ব কারো বিদ্রূপবান গায়ে না মেখে সোজা রামের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পাকা তুটোদিন বিছানায় শুয়ে কাটাবার পর সুরঞ্জনার সঙ্গে দেখা করবার বাসনা বলবত্তর হল। গত চারমাস সুরঞ্জনার কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় একটা পুঞ্জীভূত অভিমান যুবনাশ্বের মনের মধ্যে ফেনায়িত হয়ে উঠেছিল। এখন মান অভিমান করবার সময় নয়। তাড়াতাড়ি যুবনাশ্ব বিছানায় উঠে বসল। বেলা মাত্র চারটে বেজেছে। অনেক ডাউন ট্রেন আছে এখন। যুবনাশ্ব জামা গায় দিয়ে শিয়ালদার ষ্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সোজা নাকবরাবর সুশীলা পিসির বাড়ীতে এসে হাজির হল। সুশীল পিসি তাড়াহুড়ো করে তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালছিলো।

—পিশি—

ডাক শুনে তাড়াতাড়ি মুখ তুলেই পিশি আশ্চর্য্য হয়ে গেলো। মূর্ত্তিমান তুঃস্বপ্নের মতো সামনে দাঁড়িয়ে যুবনাশ্ব। চুলগুলো উস্কোখুস্ক। জামার বোতাম সব খোলা। মুখ শুক্‌নো। ঝোড়ো-কাকের মতো চেহারা।

—যুবনাশ্ব—ও মা কি হবে গো—কখন এলি বাছা?

—এই তো আসছি।

—এমন একটা অঘটন ঘটবে এ আমি আগে থেকেই জানি। তা' আর কি করবি বল বাছা—মন খারাপ করিস না।—এই তিন মাসে তোর চেহারার কি হাল্ হয়েছে বল দেখি।

যুবনাশ্ব বুঝতে পারল না সুশীলা পিসি কি অঘটন সংঘটনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বোবা চোখে ফ্যাল.ফ্যাল করে তাকাতেই পিসি আবার আরম্ভ করল ঃ বলি, তুই ছেলে মেয়ে তুটোর কথা একবারও ভাবলিনা। আক্কেলখানা একবার বলি! ছেলেটা যে তোর

মেয়ের ন্যাওটা সে কথা কে না জানে? কার কেতিত্বে তোর মেয়ে দু'দুটো পাশ করল শুনি?

যুবনাশ্ব অধৈর্য্য হয়ে বলল, পিসি, তুমি কি যা তা বাজে বকছ আমি বুঝতে পারছি না—সব ব্যাপার তুমি খুলে বল।

—ব্যাপার বলে ব্যাপার! একেবারে নবেল নাটক! আঙ্গুরের মেয়ে সুরোর যে আজ বিয়ে!

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়ায় হাজার ফিট নীচু কালভার্টে পড়ে গেল যুবনাশ্ব। সুশীলা পিসির কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বলল—তুমি কি বলছ পিসি—রঞ্জনার বিয়ে—কারসঙ্গে—কখন—

—বাছা অত উতলা হসনে। আয়, মাদুরে বস আগে, সব বলছি।

যুবনাশ্ব দাওরায় পাতা মাদুরে বসলে সুশীলা পিসি আরম্ভ করল: ব্যাপারটা হল গিয়ে—অনেকদিন আগে—তা মাস চার পাঁচ হবে—তুইও তখন এখানেই ছিলি—সুশোভনার এক বিলেত ফেরত মামাতো ভাই বেড়াতে এসেছিল—খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার—ধনঞ্জয় না কি যেন অমনি নাম—শুনলুম হাজার টাকারও বেশী মাইনে পায়। পাড়াটা ঘুরে বেড়াতে বেডাতে পুকুর ঘাটে সুরোকে বাসন মাজতে দেখে। সুরোকে দেখেই ওর মনে ধরে যায়—অমন খাসা মেয়ে—মনে তো ধরবেই। তারপর ধনঞ্জয় আঙ্গুরকে গিয়ে বলে সে সুরোকে বিয়ে করবে—এক পয়সাও নেবে না, পরন্তু গরীব বলে বিয়ের খরচ বাবদ সুরোর মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দু'হাজার টাকা দিয়েছে—এসব ভেতরকার খবর। আজ রাত দশটায় লগ্ন—বর এই এলো বলে। আমরাও বলি বাপু, তোর কাছে টাকাটাই বড় হল? আমাদের ছেলেই কি ফেলনা? তুই বাছা দুঃখ করিস না—আমি তোর ভালো টুকটুকে বৌ এনে দেবো—তুই বোস বাছা আমি তোর চা করি—আজ আর রাঁধব না—ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন—তোকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

—তোমায় নেমন্তন্ন করেছে তুমি যাবে? আমি কেন যাবো শুনি? আমি তোমার বাড়ীতেই খাবো।

—ওমা, ওসব কি অনাছিষ্টি কাণ্ড গো। আমি তো ভাবলুম নেমন্তন্ন পেয়েই তুই এসেছিস—বাছা আঙ্গুরের কাণ্ড কারখানা বলিহারী। একবার তোকে মুখের নেমন্তন্ন অবধি করল না—এতো ধম্মে সইবেনা।

—ওসব কথা থাক পিসি—দেখো তুমি যেন কাউকে জানিও না আমি এখানে এসেছি। আর শোনো, কাল সকালেইতো রঞ্জনা শ্বশুরবাড়ী যাবে না?

-হ্যাঁ—তবে সকাল মানে এগারোটার আগে নয়।

—একটা কাজ করতে পার পিসি? কাল সকালে গোপনে রঞ্জনার সঙ্গে একবার আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পার?

—খুব পারি। কাল ভোরে যখন সুরো কাপড় কাচতে যাবে লালদীঘিতে সেই সময় তুই মণ্ডলদের পিয়ারা তলায় থাকিস আমি তোদের সাক্ষেত করিয়ে দেবো।

—রঞ্জনার সঙ্গে দেখো যেন আর কেউ থাকে না।

—সে কথা আবার বলবি কিরে? তুই এসেছিস একথা সুরোকে বলব?

—না, কাল সকালের আগে যেন কেউ একথা জানতে না পারে।

—আচ্ছা, তুই বোস, তোর খাবারের জোগাড় দেখি।

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না পিসি, আমার ক্ষিদে নেই, আমি খাবো না।

সুশীলা পিসি চলে যেতে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে আমি বুঝবখন।

পূর্বব্যবস্থা মত পরদিন প্রত্যুষে যুবনাশ্ব পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে সুরঞ্জনার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পরেই দ্রুত এবং লঘু

পায়ে সুরঞ্জনাকে আসতে দেখা গেল। পরিধানে বাসন্তী রংয়ের সিল্কের সাড়ী। সীমন্তের দীর্ঘ সিঁদুরের উজ্জলরেখা পাতিব্রত্যের দীপ্তিতে ভাস্বর। চন্দনচর্চিত সারা মুখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি আর সম্ভোগের চিহ্ন নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়াল যামিনীর কামিনী।

—রঞ্জনা। গাছের আড়াল থেকে দুঃখদারুণ রুদ্র বেশ নিয়ে ছিন্ন বেশী ভিন্ন দেশী বেরিয়ে এলো।

—যুবনাশ্ব --যুবনাশ্ব—সুরঞ্জনা যুবনাশ্বের বুকে ভেঙ্গে পড়ল।

—আমাকে ভুলে, কেমন করে এতোদিন দূরে সরে ছিলে তুমি? যদিবা এলে তবে কেন এতো দেরী করলে—একটা দিন আগে আসতে পারলে না? কথা কান্না হয়ে ঝরে পড়ল সুরঞ্জনার গলায়:

—চমৎকার অভিনয় করতে শিখেছ। ওঠো রঞ্জনা, অনেক ন্যাকামো হয়েছে। প্রশ্ন শুধু তোমারই নয় আমারও আছে। জবাব শুধু আমি নয়, তুমিও দেবে। গত তিন মাস ঠিকানা দিয়ে তোমায় অন্ততঃ কুড়িখানা চিঠি দিয়েছি কিন্তু তার একটারও জবাব তুমি দাওনি।

যুবনাশ্বকে থামিয়ে দিয়ে সুরঞ্জনা বলল, সবটা শুনলে তুমি আর আমায় দোষারোপ করবে না যুবনার্শ্ব। বিশ্বাস কর তুমি, তোমার লেখা একটা চিঠিও আমার হাতে আসেনি। একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছিল—তার খবর আমি কাল পেয়েছি। পিয়নের সঙ্গে যোগসাজস করে তোমার পাঠানো সব চিঠিই মা আমার কাছে চেপে গিয়েছিল। তোমার চিঠি না পেলে তোমাব ঠিকানা না জানা থাকলে আমি কেমন করে চিঠি দেবো বল?

--তোমার মা—মানে মাসীমা এই সব করেছেন?

মাথা নীচু করে অস্ফুটস্বরে সুরঞ্জনা বলল, হ্যাঁ, আমার মা, তিনি—

থাবা দিয়ে সুরঞ্জনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যুবনাশ্ব বলল, আর বলতে হবে না রঞ্জনা, সব বুঝেছি। তিনি আমাকে তাঁর উচ্চশিক্ষিতা

সুন্দরী মেয়ের উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করেন না। সত্যই তো চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে ফেরীওয়ালার সঙ্গে এমন খাপসুরৎ মেয়ের বিয়ে কোন্ মা দিতে চায়? বিদ্রূপের ভ্রূভঙ্গী করে সুরঞ্জনার চিবুকটা তুলে ধরল যুবনাশ্ব।

এক ঝাট্‌কায় যুবনাশ্বের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে সুরঞ্জনা বলল, বল, বল যুবনাশ্ব—তোমার মনের সাধ মিটিয়ে সব বল। আমি অপরাধী—তোমার অশালীন, অশোভন সব অপমানই আজ আমি মাথা পেতে নেবো।

—চল, রঞ্জনা, আমরা দুজনে পালিয়ে যাই। যুবনাশ্ব সুরঞ্জনার একটা হাত চেপে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

—ছিঃ যুবনাশ্ব, তুমি আমার শিক্ষাগুরু, আমার জীবনদেবতা—তুমি এমন নোংরা প্রস্তাব করবে এ আমি ভাবতেই পারি না।

হঠাৎ অক্ষমের বিক্ষোভের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটে গেল। যুবনাশ্ব সহসা সুরঞ্জনার রক্তাভ গালে বেমক্কা এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, Frailty! thy name is woman. স্বামীর সোহাগ পেয়েই সব ভুলেগেছ—ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একরাত কাটিয়েই মন মজে গেছে—

যুবনাশ্বের দুঃখদারুণ রুদ্রমূর্ত্তি দেখে সুরঞ্জনা ভয় পেয়ে দুপা পিছিয়ে এলো। কঠিনকণ্ঠে সে বলল, ভদ্রভাবে কথা বলবে যুবনাশ্ব—মনে রাখবে তুমি একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছ।

—I see! এতোদিন ধরে ন্যাকামো করতে—কপট প্রেমের অভিনয় করতে তোমার লজ্জা হল না? ককেট—বেবুশ্যে—

—যুবনাশ্ব তুমি যে এতো নীচে নেমেছ—এতো ইতর হয়েছ এ আমি জানতাম না। জানলে—

—বল বল থামলে কেন?

—জানলে তোমার সঙ্গে দেখা করতাম না। আমি চললাম।

আদিম মানুষের হিংস্র বর্ব্বরতা যুবনাশ্বের চোখেমুখে বাঙ্ময় হয়ে উঠল। তার চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল বাচ্চাহারানো বন্য বাঘিনীর

রক্তলোলুপতা। বাঘের মতো একলাফে সুরঞ্জনার সামনে এসে পথরোধ করে দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, যদি এখন তোমায় অক্ষত অবস্থায় যেতে না দিই?

সুরঞ্জনা চলে যাচ্ছিল। ঘুরে দাঁড়াল। দৃঢ়পায়ে যুবনাশ্বের কাছে সরে এসে বলল, মনে মনে এতোদিন যাকে নরবর ভেবে কুমারীহৃদয়ের নৈবেদ্য অর্পণ করেছিলাম আজ—জানলাম সে বররুচি বর নয়—বর্ব্বর। বর্ব্বর জানোয়ারের হাত থেকে কোনদিন কোনো অবলা নারী আত্মরক্ষা করতে পেরেছে কি? পারেনি। নরপশুর হাতে নারীধর্ষণ কাহিনীর এক নতুন সংযোজনা হলে মানুষের লজ্জা পাবার কোনো কথা নয়। তাছাড়া পশু হলেও তুমি আমার প্রিয়। বেশ তো, তোমার দেওয়া অপমান ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কারের মতো আমার দেহে শোভা পাক্। কই, এগিয়ে এসো?

যুবনাশ্ব মুখ ফিরিয়ে অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল, তুমি যাও, রঞ্জনা।

লঘুপায়ে সুরঞ্জনা চলে গেল।

## ( পনেরো )

বুকের মাঝে রক্ত ঝরে, দেখতে কি পাও?

জীবনের জতুগৃহে আদর্শের সুখস্বপ্ন জ্বলেপুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। ভোগলিপ্সু বিদ্রোহের উন্মত্ত মনোভাব নিয়ে যুবনাশ্ব কলকাতায় ফিরে এলো। রুমমেটের কাছে শুনল মহাশ্বেতা প্রায় রোজই তার খোঁজে আসছে। কিন্তু আর না—আর ভালবাসাবাসি খেলা নয়—শ্রেয়সী প্রেয়সীর পালা চুকে গেছে—ওসব আর না। সে আর গাড্ডায় পড়তে রাজী নয়, এবার তার চাই শুধু হৃদয়হীন

নারীমাংস। মহাশ্বেতার কাছে আর সে ধরা দেবে না। বেদনাবিদ্ধ কোমল হৃদ্‌পিণ্ডকে আর সে ক্ষতবিক্ষত করতে চায় না। নারী হবে শুধু তার নর্মসহচরী। কোনো মেয়েকে সে বিশ্বাস করবে না। সব মেয়েই সমান। সব মেয়েই এক একটি বড় অভিনেত্রী। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ওরা সব পারে। স্থূলদেহ ছাড়া মেয়েদের মন বলে কোনো সূক্ষ্ম পদার্থ নেই। সব অপদার্থ। কাউকে কিছু না জানিয়ে যুবনাশ্ব সেদিনই বড়বাজারের এক মেসে উঠে গেল। কর্মক্ষেত্র শিয়ালদা থেকে হাওড়ায় স্থানান্তরিত করল। কিন্তু বিচ্ছেদ হলেই মন থেকে উচ্ছেদ হয় না।

সন্ধ্যাবেলায় যুবনাশ্ব চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। ভোলা এসে ঠেলা দিয়ে বলল, চল, একটু স্ফূর্ত্তি করে আসা যাক।

ভোলা যুবনাশ্বের সহকর্মী এচং নিশাচর। চরিত্রহীন এবং সেই হেতু স্বাস্থ্যহীন। হাড়গিলের মতো লক্কড়মার্কা চেহারার ফক্কড়। ভোলার কথা শুনে যুবনাশ্বের বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। এখনো তার মনের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে। কিন্তু রাম-ভোলা আর মনারদল সারা পৃথিবী জুড়ে ওৎপেতে বসে আছে। অসতর্কতার সুযোগ পেলেই ঘাড়েব উপর লাফিয়ে পড়বে। যুবনাশ কিছু না বলে ইতস্ততঃ করছে দেখে ভোলাই আবার বলল, আবে শালা মধুমিতা যে সে মাগী নয়, একদিন গেলেই বুঝবি।

নাম শুনে যুবনাশ্ব চমকে উঠল। কোথায় যেন এ নাম সে শুনেছে। কোথায়? কোথায়? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল রামের কথা। কেন্দ্রচ্যুত, লক্ষ্যভ্রষ্টজীবনে তার আদর্শ নেই। জীবনের উপবৃত্ত কক্ষপথে আবর্ত্তিত বন্ধ্যা ভবিষ্যৎ। প্রিয়জন যখন কেউ নেই, কার প্রতীক্ষায় সে ধূপজ্বালিয়ে বসে প্রহর গণনা করবে? জীবন-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের জন্যে, প্রয়োজন হলে, সে নর্দ্দমার পাঁকও খাবে। ফস্ করে জিবটা শব্দ করে উঠল, চল, যাবো।

অনেক গলিপথ ঘুরে অবশেষে ভোলা যুবনাশ্বকে নিষিদ্ধ পাড়ায়

মধুমিতার ঘরে নিয়ে এলো। লালআলোর জগৎ। মধুমিতা ঘরেই ছিল। সমাদর করে তুজনকে বসালো। যুবনাশ্বের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল—লজ্জায় সারাক্ষণ সে ঘাড় হেঁটকরে বসেই রইল। রাজ্যের লজ্জা এসে তাকে আক্রমণ করেছে।

—কি ব্যাপার তোমার বন্ধুর? ও চোখ তুলে তাকাচ্ছে না কেন?

—আরে। আজ ওর হাতেখড়ি। একেবারে নয়া আদমী—এ লাইনে আনকোরা নতুন আমদানী। মধুর গন্ধ পেলে দেখবে ও আর মধুমিতাকে ছাড়বে না, মাইরি বলছি।

মধুমিতা যুবনাশ্বের কাছে সরে এসে তার গাল টিপে দিয়ে বলল, অতো লজ্জা যদি তবে আর বেশ্যাবাড়ী আসা কেন গা?

লজ্জা, সংকোচ আর বিবেক দংশনে যুবনাশ্ব এতটুকু হয়ে গেল। সারা শরীর তার ঘেমে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কখনো এপথ সে মাড়াবে না।

ভোলার আদেশমতো ঘুমুর পরে মধুমিতা নাচল। ওরা তুজনে অনেকখানি ঝাঁঝালো মদ গিলল। গলা জড়াজড়ি করে ঢলাঢলি করল। অসম্বৃতবাস মধুমিতা এবং ভোলা তুজনেই যুবনাশ্বকে মদ খাবার জন্যে অনেক সাধল। কিন্তু যুবনাশ্ব রাজী হল না। অনেক রাতে যুবনাশ্বকে নিয়ে ভোলা বাসার দিকে পা বাড়ালো।

—মধুমিতাকে দেখলি?

—হুঁ, দেখলাম।

—কেমন লাগল?

—বেশ্যাকে আবার কেমন লাগবে—যেমন লাগে সবার।

—দেখ্—ভোলা সহসা যুবনাশ্বের কাছে সরে এসে কানে কানে গভীর ষড়যন্ত্রের জগুপ্সায় ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল—ওই মধুমিতার অনেক গয়না আছে—ক্যাশ টাকাও বেশকিছু আছে—সর্বসাকুল্যে হাজার দশেক তো হবেই।

যুবনাশ্ব বুঝতে না পেরে নির্বোধের মতো বলল, ওর টাকা আছে, তাতে তোর কি ?

—সুবিধামতো মধুমিতাকে ঘায়েল করে ওগুলো গায়েব করতে হবে। ভোলার ঘোলাটে চোখের তারায় বন্য বাঘিনীর রক্ত-লোলুপতা জ্বলজ্বল করে উঠল।

ইঙ্গিত শুনে ভয় পেয়ে শিউরে উঠল যুবনাশ্ব। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরা নিঃসংকোচে একজন নিরপরাধ মানুষের বুকে ছুরি চালাতে দ্বিধা করে না।

পরের দিন সবার অলক্ষ্যে যুবনাশ্ব দুপুরবেলা মধুমিতার কাছে এসে উপস্থিত হল। মধুমিতা তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। দরজা নাড়ার সাড়া পেয়ে আলুথালু বেশে দরজা খুলে যুবনাশ্বকে দেখে সে আশ্চর্য্য হয়েগেল। মুহূর্ত্তমধ্যে মুখে হাসি টেনে এনে মধুমিতা যুবনাশ্বকে অভ্যর্থনা করল, এসো—এসো—

বেকুবের মতো নংপুংসক বোবা হাসি হেসে যুবনাশ্ব বিছানায় বসল। মধুমিতা দরজা বন্ধ করে পাখা চালিয়ে দিয়ে যুবনাশ্বের পাশে ঘনিষ্ট হয়ে বসে বলল, কিগো বন্ধু, পথ ভুলে নাকি ?

উত্তর দিতে গিয়েও লজ্জা তার কণ্ঠরোধ করেদিল। যুবনাশ্ব কিছু বলতে পারল না। মধুমিতা আদর করে তার চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বলল, কি গো কথা বলছ না কেন ? অতো লজ্জা কিসের ? ঘরে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

যুবনাশ্ব ভিতরে ভিতরে সাহস সঞ্চয় করছিল। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিল, পথভুলে কি কেউ এতো অন্ধকার গলিতে আসতে পারে?

মধুমিতা হাসতে হাসতে বলল আমাকে খুব ঘেন্না করছে, তাই না ?

—না। ঘেন্না করলে এখানে আসতাম না। তোমায় আমার ভালোই লাগছে।

—ভাল লাগলেই ভালো। সবাইকে ভালবাসাই তো আমাদের ব্যবসা। পাঁচজনের মন জুগিয়েই তো আমরা বেঁচে থাকি।

যুবনাশ্ব সহসা বলে ফেলল, তুমি ভোলাকে চেনো মাধু?

—ওমা, ওকে আবার চিনবনা কেন? প্রত্যেক সোমবারে ও আমার কাছে আসে—কাল সন্ধ্যায় ওই তো তোমায় নিয়ে এসেছিল।

—তুমি জানো, ওর স্বভাবচরিত্র মোটেই ভালো নয়?

বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে মধুমিতা বলল, বোকাছেলে কোথাকার! স্বভাবচরিত্র ভালো হলে কেউ বুঝি আমাদের কাছে আসে?

যুবনাশ্ব বৃশ্চিকের দংশন অনুভব করল। ভোলার স্বভাবচরিত্র খারাপ মানে সে যে খুনও করতে পারে। সে কি মাধুকে বলে দেবে কালরাত্রে ভোলা তাকে যে কথা বলেছে? টাকার লোভে সে তাকে খুন করতে পর্য্যন্ত পারে? আর বলে কাজ নেই। শুধুশুধু মাধু ভয় পাবে। এমনও তো হতে পারে যে মদের নেশায় ভোলা তার কাছে নিছক ভুল বকেছে? দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে যুবনাশ্ব বলল, ভোলা সৎলোক নয় মাধু—সে তোমার অনিষ্ঠসাধন করতে পারে।

—এ পাড়ায় যারা ঘোরাঘুরি করে তারা কেউই সৎলোক নয়। আর অনিষ্ট তো সামান্য কথা— জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে আমাদের ব্যবসা করতে হয়। মুখ্যু বেকার পুরুষ হয় গুণ্ডা আর অসহায় মুখ্যু মেয়েরা হয় বেশ্যা। লেখাপড়া তো আর শিখিনি, তাই জীবিকার এই বিপদসঙ্কুল পথই বেছে নিতে হয়েছে।

যুবনাশ্ব শুধু বলল, তুমি সাবধানে থেকো মাধু আজ আমি চলি—

—দূর, এই ধুলোপায়ে চলে যায় বুঝি? তুমি বসো আমি চা নিয়ে আসি।

মধুমিতা চা না খাইয়ে সত্যসত্যই ছাড়ল না।

মধুমিতা যুবনাশ্বের সামনে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, আবার কবে আসবে বল ?

—তুমি যেদিন বলবে।

—কাল আসবে। সন্ধ্যে থেকে লোক আসাযাওয়া করে, ওসময় আসবেনা—এমন সময় আসবে কেমন ?

—আচ্ছা, তাই হবে।

—কথা দিচ্ছ ?

—দিচ্ছি !

মধুমিতা বহুবল্লভা স্বৈরিণী। লজ্জাশরম তার নেই সত্যি। কিন্তু সে নারী। নারীর নারীত্বটুকু ভোলা সে কি সহজ কথা ? কি জানি কেন যুবনাশ্ব মধুমিতার জন্যে মনের গোপনে এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ অনুভব করে। পরের দিন যুবনাশ্ব আবার মধুমিতার কাছে গেল। শীঘ্রই দেখা গেল মধুমিতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে। বিকালের দিকে মধুমিতার কাছে যাওয়া নিয়মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ল। সেদিন একটু আগে আগেই যুবনাশ্ব মধুমিতার কাছে যাবার জন্যে বার হচ্ছিল এমন সময় পিছনথেকে ভোলা বাঘের মতো লাফিয়ে এসে তার জামার কলার চেপে ধরল।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

যুবনাশ্ব থতমত খেয়ে গেল। আমৃতা আমৃতা করে বলল এই একটু বেড়াতে—মানে দরকারে—

—তুই শালা বড় সেয়ানা। ডুবেডুবে জল খাচ্ছিস বলে ভেবেছিস কেউ টের পাবে না ? জানিস্, ভোলার চোখ এড়ানো অত সহজ নয় ? আমি জানি তুই রোজ কোথায় যাস—তুই মাধুর কাছে যাচ্ছিস।

—বেশ করছি যাচ্ছি। বেশ করব যাবো। ওকি তোর মাগ না বাঁধামেয়েমানুষ ?

কি যেন ভাবল ভোলা। জামার কলার ছেড়ে দিয়ে বলল, হুঁ, আচ্ছা যা—

## ( ষোল )

শরীর ভালো না থাকায় সেদিন সন্ধ্যার আগেই যুবনাশ্ব চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ভোলা এসে ঠেলে দিয়ে বলল, এই নে শালা, তোর চিঠি। ভোলা চিঠিটা যুবনাশ্বের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। কে তাকে চিঠি লিখবে? যুবনাশ্ব তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে চিঠিটা খুলল। একটি ছোট কাগজে মাত্র দুটিছত্র লেখা রয়েছে। 'যুবনাশ্ব, তুমি আজ রাত্রি এগারোটার সময় আসবে আমার ঘরে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তোমার মধুমিতা।'

মধুমিতা তাকে পত্র লিখেছে। দেখা করতে বলেছে। নিশ্চয়ই কিছু জরুরী দরকার পড়েছে। যুবনাশ্ব একবার ভাবল এখনি একবার চলে যায়। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের আগে যাওয়া উচিৎ হবেনা। এখন সে নিশ্চয়ই অন্যলোকের সঙ্গে ব্যস্ত আছে। যুবনাশ্ব ঘরের ভিতর আস্থিরভাবে পাইচারি আরম্ভ করল। গায়ে জামাটা চড়িয়ে দিয়ে পার্কের নির্জনতম কোণে এসে চুপকরে বসল। এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে যুবনাশ্ব মধুমিতার কাছে যাবার জন্যে পা বাড়াল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সোজাসুজি দোতালায় মধুমিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। মধুমিতার ঘর অন্ধকার। তবে কি এখনও তার ঘরে লোক আছে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে যুবনাশ্ব দরজায় টোকা দিল। ভিতর থেকে কোন সাড়া এলোনা কিন্তু ভেজানো দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেল। ভিতরে গাঢ় তরল অন্ধকার। সাহস সঞ্চয় করে সুইচ টিপতেই যে মর্মন্তুদ দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল। রক্তলিপ্ত মধুমিতার মৃতদেহ বিছানার উপর পড়ে রয়েছে। যুবনাশ্ব অস্ফুট আর্তনাদ

করে উঠল, মাধু, শয়তান তোমায় খুন করেছে। কাছে এসে দেখল একটি দীর্ঘ ছোরা তার বুকে আমূলবিদ্ধ হয়ে রয়েছে। চাপ চাপ লাল রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত্তও দেরী করা বিধেয় নয় বিবেচনা করে যুবনাশ্ব পড়ি কি মরি করে ছুটে পালিয়ে গেল। দরজায় দাঁড়ানো অন্য মেয়েরা তাকে অমনকরে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখে হতবম্ভ হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে যুবনাশ্ব তার ডেরায় ফিরে এলো! দারুণ দুশ্চিন্তায় সারারাত সে ঘুমতেই পারলনা। সকালে উঠেই যুবনাশ্ব ভোলার খোঁজ করল কিন্তু তাকে পাওয়া গেলনা। গত রাত থেকেই ভোলা মেস থেকে অন্যত্র সরে পড়েছে। পুরো একটা দিন যুবনাশ্ব মেস থেকে একপাও বার হলনা। পরের দিন কাগজে কাগজে এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণী ছাপা হতেই সারা শহরে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সবার মুখেই খুনের কথা। খুনের বিবরণের সঙ্গে তার নাম জড়িত দেখে যুবনাশ্ব বজ্রাহত হয়ে গেল। সংবাদটি এইরূপ : রাত্রি দশঘটিকায় মধুমিতা নামক এক পতিতাকে নৃশংসভাবে হত্যাকরা হইয়াছে। সমস্ত টাকা এবং অলঙ্কার খোয়া গেছে সুতরাং স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা যায় যে টাকার লোভে এই গণিকাটিকে হত্যা করা হইয়াছে। কে বা কাহারা এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক তাহা এখনো সঠিক জানা যায়নি। তবে ঘর থেকে যুবনাশ্ব নামক এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা একটুকরো কাগজ পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি এগারোটার সময় বাড়ীর অন্যান্য গণিকারা তাহাকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়াছে। পুলিস সন্দেহ করিতেছে খুব সম্ভবতঃ যুবনাশ্ব নামক ব্যক্তিটি এই খুনের সঙ্গে জড়িত। এখনো পর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। জোর তদন্ত চলিতেছে।

কাগজখানি যুবনাশ্বের শিথিল হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ল। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। দুচোখে সে অন্ধকার দেখল। মধুমিতার লেখা চিঠি সে হাতে করেই নিয়ে গিয়েছিল। মধুমিতার

মৃতদেহ দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই চিরকুটটা হাত থেকে মেঝেতে খসে পড়েছিল। একেই বলে চরম দুর্ভাগ্য। নিয়তির নির্ম্মম চক্রান্তে পড়ে আজ জনচক্ষে সে খুনী। সে জানে কে এ খুন করেছে। কিন্তু জানলেই হল না। প্রমাণের প্রয়োজন।৷ প্রমাণ করা অতো সহজ নয়। মানুষের গড়া আদালতে সে সুবিচার পাবে না—সে জানে বিচারের নামে চলে অবিচার। অত্যাচার।

দিনতিনেক পরে সন্ধ্যাবেলায় ঝোড়োকাকের মতো চেহারা নিয়ে ভোলা মেসে এলো। ভোলাকে দেখেই যুবনাশ্ব বাঘের মতো লাফিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁতচেপে সে বলল, ভোলা, আমি জানি তুই এ কাজ করেছিস।

—কি কাজ? ভোলা যেন কিছুই জানে না।

—টাকা আর গহনার লোভে তুই মধুমিতাকে খুন করেছিস।

ভোলা নির্বিকার অম্লানমুখে বলল, সে কথা প্রমাণ করা শক্ত। আদালত অন্যকথা বলবে—সে তোকেই খুনী বলবে। আঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ করিস না। আস্তে কথা বল, দেওয়ালেরও কান আছে।

—তুই আমায় মিথ্যা মিথ্যা খুনী বানাতে চাস ভোলা। মধুমিতার নাম দিয়ে মিথ্যে করে তুই আমায় চিঠি লিখেছিলি।

—যা হয়ে গেছে, ও নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। কথা হচ্ছে আমি তোকে ভালবাসি—তোকে আমি বাঁচাতে চাই—তুই এখনই ভেগে পড়। দু'একদিনের মধ্যেই পুলিশ তোর খোঁজে এখানে এসে হামলা দেবে। অনেক দিক্‌দারী ভোগ করতে হবে। তুই কিছুদিন কলকাতার বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে থাক—এইনে টাকা - সরে পড় এখন।

বিনা অপরাধে ফাঁসির দড়িতে লটকে পড়তে অথবা সেলুলার জেলে জীবনের বারোটা বছর কাটিয়ে আসতে যুবনাশ্ব চায় না। এতো তাড়াতাড়ি সে মরবে না। কীট ব্যাগ হাতে নিয়ে সে শিয়ালদা ষ্টেশানের দিকে বেরিয়ে পড়ল। চুরি না করেও চোরের মতো লুকিয়ে

লুকিয়ে দেশে পালিয়ে যেতে হবে। বাঁচার তাগিদে পালিয়ে যাওয়ার তাগাদা। কিছুদূর চলার পরই পিছন থেকে ডাক এলো, যুবনাশ্ব।

চম্‌কে উঠে থম্‌কে গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল কাকা।

—কাকাবাবু, আপনি?

—কাকাবাবু সরে এসে বললেন, তুই যাচ্ছিস কোথায়?

—হুগলী।

কাকাবাবু কাছে সরে এসে নীচুগলায় বললেন, বুঝিছি তুই কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাস—খুনখারাবীর কথা কাগজে আমি দেখেছি। হুগলী গিয়ে আর কাজ নেই—চল্‌, আমার বাড়ীতেই লুকিয়ে থাকবি।

যুবনাশ্বকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই কাকাবাবু চিৎকার করে উঠলেন, ট্যাক্সী—এই ট্যাক্সী—

একটি চলমান ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাকাবাবু এক রকম টেনেই যুবনাশ্বকে ট্যাক্সীতে তুললেন। যুবনাশ্বকে বাড়ীতে এনে কাকাবাবু বললেন, কালোসোনার ঘরেই থাকবে তুমি।

যুবনাশ্বকে আবার সশরীরে আসতে দেখে কাকীমা তেলেবেগুনে জ্বলে গিয়ে স্বামীকে বললেন, বলি, হ্যাঁগা, পিঠ চুলকে ঘা করবার অতো সখ কেন? ও হারামজাদাকে আবার আনা হয়েছে কেন শুনি?

হাত ধরে গিন্নীকে রান্নাঘরে টেনে এনে কাকাবাবু চুপি চুপি বললেন, মতলব আছে গিন্নী, মতলব আছে। যুবনাশ্ব একটা মাগীকে খুন করে ফেরারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—পুলিশ ওর নামে হুলিয়া বার করে সারা শহর তোলপাড় করছে। ওকে ধরে দিতে পারলে সরকারী পক্ষ থেকে পুরস্কার মিলবে। আমি কাল সক্কালেই পুলিশে খবর দিচ্ছি।

প্রস্তাবটা কাকীমার কেমন যেন মনঃপূত হল না।

—কাজটা কি ভাল হবে? এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই নয়?

—দেখো, তুমি মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষের মতোই থাকবে—এ সব ব্যাপারে মাথা গলাতে এসো না। একটা খুনী আসামী লচ্চার, কেন তাকে ধরিয়ে দেবো না শুনি? অন্যায়কে প্রশ্রয় আমি কিছুতেই দেবো না। অধিকতর চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে কাকাবাবু বললেন, বোঝো না গিন্নী পুলিসসায়েবের নেক্ নজরে পড়লে, চাই কি, কেলোর একটা চাকরীও জুটে যেতে পারে।

—তা' বটে। কাকীমা সায় দিয়ে বললেন।

পরের দিন দুপুর বেলা যুবনাশ্ব সবে খেতে বসেছিল। দশদিক সচকিত করে পুলিশভ্যান বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। দুজন কনেষ্টবল সাথে নিয়ে একজন ইন্‌স্‌পেক্টর ভারী বুটের শব্দ তুলে বাড়ীতে এসে ঢুকলেন।

—আপনার নামই কি যুবনাশ্ব লাহিড়ী?

খাওয়া বন্ধ রেখে যুবনাশ্ব বলল, হ্যাঁ।

—আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে—আপনাকে arrest করতে আমরা বাধ্য হলাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, খাচ্ছেন খেনে নিন।

—না,—থাক,—চলুন।

যুবনাশ্ব উঠে দাঁড়ালো।

যুবনাশ্বের গ্রেপ্তার সংবাদ কাগজে কাগজে বার হল। মধুমিতা নামক এক গণিকার খুনের সঙ্গে যুবনাশ্বের নাম জড়িত দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মহাশ্বেতা। যুবনাশ্বের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদে সে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে বিছানায় আছড়ে পড়ল। স্নান খাওয়ার জন্যে একবারও সে উঠল না। ঝি চাকরেরা ডাকতে এলে মহাশ্বেতা কখনও বা তেড়ে মারতে যায়, কখনো বা চুপচাপ শুয়ে থাকে, কোনো সাড়া দেয় না। কারখানা থেকে ফিরে বীরেনবাবু সব শুনলেন। বাবুজীর ডাকাডাকিতে মহাশ্বেতাকে দরজা খুলতেই হল।

কন্যার রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বাবুজী বললেন, কি হয়েছে মা তোর? চান করিসনি, সারা দিন কিছু খাসনি—বল মা তোর কি হয়েছে?

মহাশ্বেতা বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে শুধু কাঁদে আর কাঁদে। অনেক অনুনয়ের পর সে বলল, এ সব মিথ্যে ষড়যন্ত্র বাবুজী—কিছুতেই সে এসব কাজ করতে পারে না—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

—কি তুই বিশ্বাস করিসনে মা? কি হয়েছে সব খুলে না বললে কেমন করে বুঝব বল?

মহাশ্বেতা কোনো কথা না বলে সংবাদপত্রের একটি বিশেষ অংশের দিকে ইঙ্গিত করে কাগজখানি বাবুজীর হাতে তুলে দিল। বাবুজী নিঃশব্দে সংবাদটা পড়লেন।

—বাবুজী তুমি বিশ্বাস কর যুবনাশ্ব এত নীচ কাজ করতে পারে?

বাবুজী ঘাড় নেড়ে বললেন, না, মা। আমি যুবনাশ্বকে জানি—টাকার জন্যে এ হীন কাজ সে করতে পারে না।

—সব ষড়যন্ত্র। জানো বাবজী, পৃথিবীর যত লোক আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। বাবুজী—

—কি রে বেটি?

—যুবনাশ্ব তো অনেকদিন তোমার ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছে, তোমার cash ওর হাতে থাকত। কোনো দিন তোমার টাকাকড়ির কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল?

—না, মা যুবনাশ্ব তেমন ছেলেই নয়।

—তবেই বল বাবুজী, সে কখনো টাকার জন্যে একজন পতিতাকে খুন করতে পারে? যদি তার টাকার দরকার হয়েছিল, কেন সে এসে আমার কাছ থেকে টাকা চাইল না? কেন সে এসে আমায় তার difficulties জানালো না? রাগের মাথায় চলে

যেতে বলেছি বলে কি সত্যসত্যই আমি ওকে চলে যেতে বলেছি? কেন ও আমার অন্তরের কথা বুঝতে পারে না বাবুজী?

বাবুজী কিছু না বলে কন্যার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

—তোমার তো অনেক টাকা আছে, তাই না বাবুজী?

—আমার টাকা বলছিস কেন মা—সে তো সব তোরই টাকা।

—যুবনাশ্বকে বাঁচাতে হবে বাবুজী—সে যদি অপরাধ করে থাকে তবুও তাকে বাঁচাতে হবে। তুমি কলকাতার সবচেয়ে বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত কর। আইনের মারপ্যাঁচে সবকিছুই হয়।

—তোর কোনো ইচ্ছা কি আমি অপূর্ণ রেখেছি মা?

আশীষ বসু কলকাতার সবচেয়ে নামকরা ব্যারিষ্টার—আমি তাকেই এ কেস দেবো। আর, হ্যাঁ, তুই নিজেই তো তাকে সব বলতে পারিস—তোর কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে না? টাকার জন্যে চিন্তা করিস না।

—বাবুজী আমি এক্ষুনি আশীষবাবুর কাছে যাচ্ছি। তুমি যুবনাশ্বকে bail দেবাব ব্যবস্থা কর।

উদীয়মান ব্যারিষ্টার আশীষ বসুর সঙ্গে মাস কয়েক আগে সুশোভনা ব্যানার্জীর লভম্যারেজ হয়। সে বিয়েতে মহাশ্বেতাও গিয়েছিল। কমিউনিটি ইনভিটেশান নয়, তার ছিল স্পেশাল ইনভিটেশান। আশীষবাবুর সঙ্গে তার বেশ ভালোই পবিচয় আছে। আমীর আলী এ্যাভেনুতে সুশোভনার বাড়ী বারকয়েক মহাশ্বেতা এসেছে। সোজা মহাশ্বেতা চলে এলো সুশোভনার কাছে। বেয়ারা সসম্ভ্রমে টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল।

—মেম সাবকো বোলাও।

—আপ ঘরমে বৈঠে। মহাশ্বেতাকে ঘরে বসিয়ে রেখে বেয়ারা চলে গেল।

সুশোভনা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, এ কি মহাশ্বেতা তুমি? পথ ভুলে নাকি?

—না—ঠিকানার সন্ধান নিয়েই এসেছি। খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ বুঝি?

—একটুও না। আমি জানতাম তুমি আসবে।

আশ্চর্য্য হয়ে গেল সুশোভনা : তুমি জানতে আমি আসব?

—হ্যাঁ, জানতাম। এতে তাজ্জব হবার কিছু নেই। তুমি যুবনাশ্বকে সত্যকার ভালবাসো মহাশ্বেতা আর তাকে বাঁচাবার জন্যে শহরের সবচেয়ে বড় ব্যারিষ্টার আশীষ বসুর বাড়ী আসবে এটা guess করা মোটেই শক্ত নয়।

—তুমি সব জানো বলে মনে হচ্ছে?

—মোটেই সব জানি না। সংবাদপত্রে যতটুকু দেখেছি ততটুকুই শুধু জানি। কিন্তু মহাশ্বেতা, ওই একটা দুশ্চরিত্র নারী-হন্তা ক্রিমিন্যালের জন্যে তোমার মতো মেয়ের উতলা হওয়া শোভা পায় না।

—তোমাদের কাছে যুবনাশ্ব ঘৃণার পাত্র হতে পারে সুশোভনা, কিন্তু সে আমার প্রেমিক—প্রিয়তম—আমার কাছে তার শুধু এই পরিচিতিই থাক—কারো কথা শুনে আমি আর ভুল করব না সুশোভনা। তোমরা, সুসভ্য পৃথিবীর মানুষের দল যখন তাকে দেখে উপহাসের হাসি হাসবে, আঁচল দিতে তখন আমি তাকে ঢেকে রেখে দেবো। আর—

আশীষ বসু ড্রয়িংরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, Susovana hates Yabanaswa because she still loves him—বুঝলেন তো মহাশ্বেতা দেবী?

—নমস্কার। মহাশ্বেতা উঠে দাঁড়াল।

—নমস্কার। বসুন, বসুন।

ব্যারিষ্টার বসু চেয়ার টেনে বসলে সুশোভনা বলল, আর কি বলতে যাচ্ছিলে মহাশ্বেতা?

—আর বলছিলাম যুবনাশ্বের যদি সত্যই কিছু অধঃপতন হয়ে

থাকে তার জন্যে আমি আর তুমি দায়ী। আমি তার কোনো কথা শুনতে চাইনি—একতরফা শুধু তোমার কথা শুনেই তাকে আঘাত দিয়েছি। ব্যারিষ্টার বসু, যুবনাশ্বকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে।

হাই তুলতে তুলতে সুশোভনা বলল, সেটা সম্ভবপর বলে মনে হয় না মহাশ্বেতা। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রায় অকাট্য। তোমার প্রেম তাকে ক্যাপিট্যাল পানিসমেণ্ট থেকে বাঁচাতে পারলেও দশ বছর সেলুলার জেল থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

—তুমি কি করে এতো সহজভাবে এত নিষ্ঠুর কথা বলছ সুশোভনা—তোমার অন্তরে কি এতটুকু দয়ামায়া নেই?

—An honest person ought not to feel for a murderer.

মহাশ্বেতা দুহাত দিয়ে ব্যারিষ্টার বসুর হাত দুটো জড়িয়ে বেদনার্দ্র কণ্ঠে বলল, মিষ্টার বসু বড়ই বিপন্ন হয়ে আপনার শরণ নিয়েছি। যত টাকা লাগে যেমন করে হোক যুবনাশ্বকে বাঁচাতেই হবে।

—আঃ করেন কি? বিব্রতভাবে মিষ্টার বসু মহাশ্বেতার হাত থেকে তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে সিগারেটে টান দেওয়ার পর বললেন, বেশ আমি এ কেস take up করলাম। আপনি ঘটনা সব আমায় খুলে বলুন। আপনি অতো উতলা হলে কোনো কাজই হবে না।

মহাশ্বেতা মিষ্টার বসুকে একে একে সব কথা খুলে বলল। শেষে অনুনয় করল, আপনি কোলকাতার সব চেয়ে বড় ব্যারিষ্টার—কোনো জটিলকেসেও আপনি বিফল হন নি। যুবনাশ্বকে বাঁচাতেই হবে মিষ্টার বাসু।

ব্যারিষ্টার বাসু সিগারেট টানতে টানতে চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, কেসটা বড়ই জটিল। আপনি আমায় ভাবিত করে তুললেন

মহাশ্বেতা দেবী। আপনি আমার গিন্নীর—মানে আমার বন্ধু—যুবনাশ্বকে বাঁচাবার জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব—তবে কিছু surity দেওয়া শক্ত। এখন প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে যুবনাশ্বের সঙ্গে দেখা করা। পুলিশের কাছে কতোখানি কি confess করেছে সেটা জানা দরকার। আমি আজ সাড়ে পাঁচটায় আপনাদের বাড়ী যাবো—যুবনাশ্বের সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন। আর আপনার হাতের তৈরী চা-ও খেয়ে আসা যাবে—কেমন মহাশ্বেতা দেবী?

—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

*　　*　　*

ব্যারিষ্টার বাসু যুবনাশ্বের কাছ থেকে জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিয়ে পরের দিন মহাশ্বেতাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। যথা সময়ে মহাশ্বেতা মিষ্টার বাসুর সঙ্গে দেখা করল। আশীষবাবু তখন চিন্তা কুঞ্চিত কপাল নিয়ে চুরুটে ঘন ঘন টান দিচ্ছিলেন।

—আসতে পারি?

—আসুন, আসুন মহাশ্বেতা দেবী। ব্যারিষ্টার বাসু উঠে দাঁড়ালেন।

মহাশ্বেতা একটা কৌচে বসতে বসতে বলল, কেসটা ভেবে দেখলেন মিষ্টার বাসু?

—হুঁ। খুব জটিল ব্যাপার। তবে আশার আলোক যেন দেখতে পাচ্ছি। Anyway, কথা হচ্ছে যুবনাশ্ব আপনার কে হয়—I mean, আপনাদের social relationটা কি?

লজ্জায় মহাশ্বেতার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। সুশোভনা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে স্বামীর কথা শুনতে পেয়েছিল। মহাশ্বেতার হয়ে সে-ই উত্তর দিল: জীবনের সবচেয়ে মধুর যে সম্পর্ক—যে সম্পর্ক তোমার আমার ওদেরও সেই সম্পর্ক। এটা যদি এখনো বুঝতে না পেরে থাকো তবে আইনব্যবসায় ছেড়ে দাও।

ব্যারিষ্টারবাবু সহাস্যে স্ত্রীকে আহ্বান জানালেন, এসো সুশোভনা।

সুশোভনা পাশে এসে বসতেই ব্যারিষ্টার বসু পরিহাসতরল গলায় স্ত্রীকে বললেন, সুশোভনা, এককালে তুমিও তো যুবনাশ্বের প্রেমিকা ছিলে না?

—সুশোভনা ব্যানার্জীর প্রেমিক ছিল যুবনাশ্ব লাহিড়ী আর সুশোভনা বোসের প্রেমিক হচ্ছেন মূর্তিমান শ্রীমান।

সুরঞ্জনার কথা বলার ভঙ্গীতে তিনজনেই হেসে ফেলল।

ব্যারিষ্টার বাসু এবার কাজের কথায় ফিরে এলেন।

—দেখুন পোষ্টমের্টেম রিপোর্ট থেকে জানা গেছে খুনটা হয়েছে রাত্রি সাড়ে নটায়। এখন যদি প্রমাণ করা যায় যুবনাশ্ব ওই সময় অন্য কোথাও ছিল তাহলে কেসটা অন্য রকম দাঁড়াবে। সেই সময় মেসে নিজের ঘরে ছিল এটা প্রমাণ করা শক্ত। আচ্ছা আপনি একটা কাজ করতে পারেন?

—একটা কেন একশোটা পারব, বলুন আপনি? উৎসাহে মহাশ্বেতা চক্‌মকিয়ে উঠল।

—কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। যুবনাশ্বের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে চিন্তার কিছু নেই, কিন্তু—ঈশ্বর না করুন, যুবনাশ্বের সঙ্গে আপনার বিয়ে না হলে—এটা আপনার নিষ্কলঙ্ক কুমারী জীবনের উপর নিঃসন্দেহে একটা spot. আপনাকে আদালতে সবার সামনে বলতে হবে যে রাত্রি নটা থেকে দশটা যুবনাশ্ব আপনার ঘরে ছিল—আপনারা শুধু দুজনে সে ঘরে ছিলেন, বিশ্রান্তালাপ চলছিল আর কেউ ছিল না।

মহাশ্বেতা চম্‌কে উঠল।

* * *

আদালতপ্রাঙ্গন লোকারণ্য। গণিকাহন্তা যুবনাশ্বের বহু প্রতীক্ষিত বিচারের দিন আজ।

সরকারীপক্ষের উকিল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর যুক্তি, তর্ক এবং

সুকৌশলী বাক্‌জাল দিয়ে বুঝিয়েদিলেন যুবনাশ্বই খুনী। যুবনাশ্বকে উদ্দেশ করে লেখা মধুমিতার চিঠি তার অকাট্য প্রমাণ। কয়েকজন পতিতাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে জবানবন্দী নেওয়া হল। তারাও একবাক্যে স্বীকার করল যে রাত্রি এগারোটা নাগাদ মধুমিতার ঘর থেকে উন্মত্তভাবে যুবনাশ্বকে পালিয়ে যেতে তারা দেখেছে।

আসামীপক্ষ সমর্থন করতে উঠলেন খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিষ্টার আশীষ বসু। তিনি প্রথমেই প্রমাণ করে দিলেন যে চিঠিটা মধুমিতার নয়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে মধুমিতার অক্ষরজ্ঞান ছিল না এবং দু একবার নাম লেখার প্রয়োজন থাকায় সে টিপ্‌সই ব্যবহার করে। সুতরাং এ চিঠি মধুমিতা যুবনাশ্বকে লেখেনি। খুনী যুবনাশ্বকে এই কেসে জড়াবার জন্যে এমন একটা ফন্দী করে ছিল। দ্বিতীয়তঃ যুবনাশ্বের বাড়ীঘর সব কিছু সার্চ্চ করেও গহনা বা টাকা কিছু পাওয়া যায়নি। তৃতীয়তঃ, পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা গেছে মধুমিতাকে খুন করা হয়েছে রাত সাড়ে নটায়। যুবনাশ্ববাবু রাত্রি সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্য্যন্ত তাঁর প্রেমিকা মহাশ্বেতা দেবীর ঘরে ছিল সুতরাং ওই সময় তাঁর পক্ষে বৌবাজারে গিয়ে খুন করা সম্ভবপর নয়। ব্যারিষ্টার বাসু তাঁর যুক্তি এবং বক্তব্য শেষ করে বিচারককে সম্বোধন করে বললেন, মাই লর্ড, স্বয়ং মহাশ্বেতা দেবী উপস্থিত, আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

মহাশ্বেতাকে ডাকা হল। সে নতমস্তকে স্বীকার করল ওই সময় যুবনাশ্ব তার ঘরে ছিল। যুবনাশ্ব যে খুনী সেটা সপ্রমাণ করা গেল না। জুরীরা এক মত হতে পারলেন না। Benefit of doubtএ যুবনাশ্ব বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

এজলাস থেকে বেরিয়ে এসে ব্যারিষ্টার বাসুর দু'হাত চেপে ধরে আনন্দ উজ্জলকণ্ঠে মহাশ্বেতা বলল, আপনার এঋণ আমি কোন দিনই ভুলতে পারব না মিষ্টার বাসু।

মৃদু হেসে আশীষবাবু বললেন, এ কেস তো আমি জিতিয়ে দিইনি—দিয়েছেন আপনি at the cost of a blame on your character. আমার গিন্নী আজ সন্ধ্যায় আপনাদের দুজনকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। মুখে সুশোভনা যাই বলুক না কেন, আমি জানি আজও সে যুবনাশ্বকে ভালবাসে। তার arrest হবার দিন থেকে সে রাত্রে ঘুমুতে পারে না, নিঃশব্দে কাঁদে, নির্জনে কি যেন ভাবে। আমি এখুনি সুশোভনাকে রিং করে বিচারকের decision তাকে জানিয়ে দিচ্ছি। Anyway, আপনাদের নিমন্ত্রণ রইল—জোড়ে আসা চাই। আমি একটু বার লাইব্রেরীর দিকে যাবো—নমস্কার।

দু'হাত একত্র করে প্রীতিস্নিগ্ধকণ্ঠে মহাশ্বেতা বলল, নমস্কার, মিষ্টার বসু।

সবার শেষে শ্লথমন্থর পায়ে রুক্ষ মলিন যুবনাশ্ব এজলাস থেকে বেরিয়ে এলো। মহাশ্বেতা দ্রুতপায়ে যুবনাশ্বের কাছে সরে এলো। দুজনে জলভরা চোখে দুজনের দিকে তাকালো। চোখে চোখে শুধু কথা হল, মুখে কেউ কিছু বলল না। অনেকক্ষণ পরে মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের হাতে চাপ দিয়ে বলল, এসো যুবনাশ্ব।

মহাশ্বেতার এ নিবেদন প্রত্যাখ্যান করবে কোন্ যুবনাশ্ব।

—কোথায় আমি আজ যাবো মহাশ্বেতা?

—বাড়ী যেতে হবে না? দুষ্টুছেলে কোথাকার। বিছানায় শুয়ে রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে মা তার ছেলের জন্যে ছটফট করছে যে!

মহাশ্বেতা যুবনাশ্বকে টানতে টানতে মোটরে এনে তুলল। গাড়ী ছাড়লে মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের এলোমেলো অযত্ন চুলে আঙুলের চিরুণী দিয়ে সযত্নে বিন্যাস করতে লাগল—মহাশ্বেতা—

—বল যুবনাশ্ব?

—আমাকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যাকথা বলে, মিথ্যা অভিনয় করে—কেন এতবড় কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে নিলে মহাশ্বেতা?

—মানুষের আদালতে সুবিচার পাব না ভেবেই তো

অবিচারের হাত থেকে তোমায় রক্ষা করবার জন্যে না হয় একটি মিথ্যা কথাই বললাম। বেশ তো, আমার জীবনে যদি কোনো কলঙ্ককালিমা লেগে থাকে তুমিই আমার সে কলঙ্ক মুছিয়ে দাও যুবনাশ্ব। মহাশ্বেতার দুচোখে অভিমানের অশ্রু টলমল করে উঠল।

যুবনাশ্ব মহাশ্বেতার কথা বুঝতে পারল না।

—সে কেমন করে সম্ভবপর মহাশ্বেতা?

—আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে—তোমার জীবনসঙ্গিনী করে তুমি আমার কুমারী জীবনের সে কলঙ্ক মুছে দাও যুবনাশ্ব। মহাশ্বেতা যুবনাশ্বের বুকের উপর শতখান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

—তুমি আমায় এতো ভালবাসা এ আমি জানতাম না মহাশ্বেতা। যুবনাশ্ব তার দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে মহাশ্বেতাকে নিবিড় করে বুকে টেনে নিল। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ নিঃশঙ্ক হল। যৌবনঋদ্ধ জীবন প্রেমে সিদ্ধ হল। যুবনাশ্ব পেনের নিব দিয়ে আঙ্গুল চিরে রক্ত বার করে মহাশ্বেতার সিঁথিতে রক্ততিলক এঁকে দিল। সেই বর্ণালী সন্ধ্যায় দুটো তরুণ প্রাণের বন্ধনগ্রন্থি জট পাকিয়ে গেল।

—মহাশ্বেতা?

—বল? মহাশ্বেতার চোখেমুখে আনন্দাশ্রুর বন্যা।

—কবির ভাষায় বলি?

—বেশ তাই বল।

যুবনাশ্ব মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করল,

'মোদের সমুখে নন্দনবন
আগলমুক্ত আবার হবে;
রবে পদতলে অলকনন্দা
ইন্দ্রধনুর তোরণ নভে।
রচি ফুলশেজ চ্যুত পারিজাতে,
পীযূষ পেয়ালা তুলে দেবো হাতে;
উধাও মলয় দুলোক ভূলোকে

মোদের প্রেমের কাহিনী কয়ে,
মোর অসাধ্য সাধনে মানবী,
নিশ্চয় তুমি সিদ্ধ হবে।'

বিগলিত মহাশ্বেতা অস্ফুটস্বরে কবির ভাষায় বলল, আমি তোমায় চিনেছি আজ তুমি আমায় চেনো, নতুন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।

যুবনাশ্ব মহাশ্বেতাকে নিবিড়তর করে নিল। ধীরে ধীরে যুবনাশ্বের ঠোঁটদুটো অমানিতা মহাশ্বেতার মুখের উপর নেমে এলো। পরমপরিতৃপ্তিতে মহাশ্বেতা চোখ বুঝল। দুর্যোগ সংক্রান্তি শেষে সূর্যোদয়ের প্রসন্ন প্রত্যাশায় জীবনের সংরক্ত রাত্রি প্রভাত হল।

---